আশারা মুবাশ্‌শারা

নিজাম সিদ্দিকী

অবশ্যই ১ সপ্তাহের ভিতর
বই জমা দিতে হবে।

আশারা-মুবাশ্‌শারা

নিজাম সিদ্দিকী

কিশোর কণ্ঠ ফাউণ্ডেশন
বই ... ...
ইস্যু তারিখ ... ...
ক্রয় মূল্য . ...
K.P.C লাইব্রেরী

যোগাযোগ পাবলিশার্স

আশারা-মুবাশ্‌শারা : নিজাম সিদ্দিকী
প্রকাশক : পরিচালক, যোগাযোগ পাবলিশার্স
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১৭৪৬৬০, ০১৭১১ ৪৪৫৭০২
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০২
দ্বিতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৭
প্রচ্ছদ : রহমত কম্পিউটার্স
মুদ্রণ : আকাবা প্রিন্টার্স

মূল্য : সত্তর টাকা

Asara Mubasshara : A Callection of Nizam Siddique
Published By Jugajog Publishers
34 North Brook Hall Road, Dhaka.
Phone : 7174660, 01711 445702
Price : Taka Seventy
ISBN : 984-656-007-9

আমার কথা

আশারা-মুবাশ্‌শারা অর্থ বেহেশ্‌তের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আবুবকর বেহেশতী, ওমর বেহেশতী, ওসমান বেহেশতী, আলী বেহেশতী, তালহা বেহেশতী, যুবাইর বেহেশতী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ বেহেশতী, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বেহেশতী, সাঈদ ইবনে যাইদ বেহেশতী, আবু ওবাইদাহ্ ইবনুল জাররাহ্ বেহেশতী।

উক্ত হাদিসের বর্ণনাকারী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) হলেন স্বয়ং আশারা-মুবাশ্‌শারারই একজন। তাঁর বর্ণিত এ হাদিসটি তিরমিযী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে। এছাড়া এ একই হাদিস হযরত সাঈদ বিন যাইদ (রা) কর্তৃক ইবনে মাজাহ শরীফেও রেওয়ায়েত করা হয়েছে। উভয়গ্রন্থেই হাদিসটি অবিকলভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দশ জনকে 'আশারা-মুবাশ্‌শারা' বলে। হাদীসটিতে দশ জনের নামের তালিকা যেভাবে করা হয়েছে। আমরাও সূচি তালিকা সেভাবে করেছি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য। তোমরা তাঁদের মধ্যে যাঁরই অনুসরণ কর, তোমরা হেদায়েত পাবে। কিন্তু তাদের মাঝেও জীবিত থাকাবস্থায় বেহেশ্‌তের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম। আমরা এখানে সে ব্যতিক্রমধর্মী দশ সাহাবীর জীবনী সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ আকারে দেয়ার চেষ্টা করেছি।

একথা মনে রাখতে হবে যে, আশারা-মুবাশ্‌শারাগণ রাসূল (সা)-এর নবুয়তের যুগ একত্রে অতিবাহিত করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও তাঁরা পরস্পর সহযোগিতার মধ্য দিয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশেষ বিশেষ কিছু ঘটনায় তাঁদের প্রায় সকলে শামিল ছিলেন বিধায় জীবনী লেখার ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে আলোচনা পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

এ সকল জীবনী পাঠ করে আমরা তাঁদের চরিত্র সম্পর্কে জানব। জানব কিভাবে কুচক্রী মানুষরূপী শয়তান মানুষে মানুষে বিভেদের দেয়াল তুলে দিয়েছিল। ঠিক তেমনি আজকে আমাদের সমাজেও তাই ঘটছে। আমাদের শুধু জীবনী পড়লে হবে না।

তাদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে সে আলোকে নিজেকে গঠন, অন্তরে কুরআন-হাদীসের নূর প্রজ্জ্বলন, সর্বোপরি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রতিটি মানুষ নিজেই নিজের বিচারের জন্য যথেষ্ট। আসুন আমরা কাল কেয়ামতের আল্লাহর দেওয়া আমলনামা পড়ার পূর্বে আজ থেকে নিজেই নিজের আমলনামা পড়তে শুরু করি। তাহলেই কেবল আমি আমার ভেতরের অন্ধকার দূর করতে পারব। সাহাবীদের জীবনী আমাদের সকলের অন্তরে সে প্রেরণা জাগরিত করুক।

আমি কখনো ধর্মীয় গ্রন্থের লেখক হবো সে বাসনা আমার মনে ছিল না। আমাদের এক ভাইয়ের দীর্ঘদিনের পীড়াপীড়িতে তাঁকে 'শত মনীষী' নামক একটি গ্রন্থ লিখে দিতে রাজি হলাম। ৮ মাসে ৩৯ জনের জীবনী লিখে আমি বুঝলাম ১০০ জন পুরো করতে হলে আমার জন্য আরো দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। অথচ তাঁর দেয়া সময় সীমা প্রায় শেষ। তাই বিনীতভাবে তাঁর কাছে অপরাগতা প্রকাশ করে যেগুলো লেখা হয়েছে সেগুলো ফেলে না রেখে আলাদা আলাদা গ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলাম। এ গ্রন্থটি তারই একটি। স্বাভাবিকভাবে অনুমান করতে পারেন জীবনীমূলক আরো কিছু গ্রন্থ শীঘ্রই বের হবে। গ্রন্থটি রচনায় যারা আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন, তাদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

গ্রন্থটিতে যদি কোন তথ্যগত ভুল, কিংবা মুদ্রণজনিত ত্রুটি চোখে পড়ে তাহলে প্রকাশকের ঠিকানায় জানালে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকব। আল্লাহ আমাদের সবাইকে জীবনী গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়ার তওফীক দান করুক। আমীন।

বাংলাবাজার, ঢাকা
২২.১২.২০০২

নিজাম সিদ্দিকী

সূচিপত্র

১. হযরত আবুবকর (রা) / ৯
২. হযরত ওমর (রা) / ১৭
৩. হযরত ওসমান (রা) / ২৮
৪. হযরত আলী (রা) / ৩৮
৫. হযরত তালহা (রা) / ৫০
৬. হযরত যুবাইর (রা) / ৫৭
৭. হযরত আবদুর রহমান (রা) / ৬৬
৮. হযরত হযরত সা'দ (রা) / ৭৩
৯. হযরত সাঈদ (রা) / ৮২
১০. হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) / ৮৭

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বইসমূহ

উপন্যাস :

১. কুমারী উপাখ্যান (বাংলা একাডেমী, ঢাকা) [১৯৯৬]
২. প্রজাপতি মন [১৯৯৭]
৩. জোছনা রাত [১৯৯৭]
৪. দুঃস্বপ্নের কালরাত্রি [১৯৯৯]
৫. মনের মানুষ [১৯৯৯]
৬. কুমারীর মন (১ম খণ্ড) [২০০১, ২০০৩]
৭. কুমারীর মন (২য় খণ্ড) [২০০১, ২০০৩]
●. কুমারীর মন (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) [২০০১, ২০০৩]

কিশোর উপন্যাস :

৮. মায়ের আদর [২০০২]
৯. বাবার আদর [২০০৭]

কাব্য :

১০. সম্মুখে বসন্ত [১৯৯৭]

গল্প :

১১. নিঃশব্দ ঝরনা [২০০০]

কিশোর গল্প :

১২. জন্মদিন [২০০২]

জীবনী :

১৩. চার খলিফা [২০০২]
১৪. ইমামদের জীবনী [২০০২, ২০০৬, ২০০৭]
১৫. আশারা মুবাশ্‌শারা [২০০২]
১৬. ছোটদের নবাব ফয়জুন্নেসা [২০০৬]

সম্পাদনা :

১৭. রূপজালাল : ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী [২০০৪, ২০০৫]
১৮. ধর্ম জীবন-যুবক জীবন-মানব জীবন : ডা. লুৎফর রহমান (জীবনী এবং রচনাপঞ্জীসহ) [২০০৪]
১৯. উচ্চ জীবন-উন্নত জীবন : ডা. লুৎফর রহমান (জীবনী এবং রচনাপঞ্জীসহ) [২০০৪, ২০০৭]
২০. মহা জীবন-মহৎ জীবন : ডা. লুৎফর রহমান (জীবনী এবং রচনাপঞ্জীসহ) [২০০৪]
২১. বাঘের বুদ্ধি [২০০৪]
২২. মাথায় কত প্রশ্ন জাগে–১ (ছদ্মনামে) [২০০২, ২০০৬]
২৩. মাথায় কত প্রশ্ন জাগে–২ (ছদ্মনামে) [২০০২, ২০০৭]
২৪. রসুল বিজয় : জয়েন উদ্দীন [২০০৭]

অনুবাদ :

২৫. আত্মসংশোধন ও সমাজ সংশোধনের কর্মপন্থা
: আল্লামা সাইয়েদ মুজতাবা মুসাভী লারী (ছদ্মনামে) [২০০৪]

পাঠ্যবই [পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত] :

২৬. মাধ্যমিক গণিত [বীজগণিত] (নবম-দশম শ্রেণীর জন্য) [২০০৫, ২০০৬, ২০০৭]

গান:

৩টি। শিরোনাম : ১. মায়ের দেশে, ২. দৃষ্টি মেলে, ৩. মাঝে মাঝে।
এলবাম – 'একাকী আমি' : সুরকার ও শিল্পী – হুসাইন আল জাওয়াদ।

হযরত আবুবকর (রা)

বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন; ইসলামের সেবায় যিনি তাঁর যথাসর্বস্ব দান করেন; যাঁর প্রচেষ্টায় হযরত ওসামান, তালহা, যুবাইর, আবদুর রহমান ও সা'দ প্রমুখ ইসলাম গ্রহণ করেন। যিনি হযরত বেলালসহ মোট সাতজন দাস-দাসীকে নিজ অর্থ দ্বারা ক্রয় করে মুক্ত করেন। যাঁকে প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচারের জন্য মক্কাবাসীগণ প্রহার করেছিল, তবু ক্ষণিকের জন্যে ঈমানের পথ হতে বিচ্যুত হবার কথা ভাবেননি। তিনি আর কেউ নন, তিনিই ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা)।

তিনি ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের বনি তাইম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। মাতা-পিতা উভয়ের দিক থেকেই আবুবকর (রা)-এর বংশ লতিকা উর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ মুররা ইবনে কা'বে গিয়ে মুহাম্মদ (সা)-এর বংশের সাথে মিলিত হয়েছে। বাবা-মা তাঁর নাম রাখেন আবদুল্লাহ। তাঁর ডাক নাম ছিল আবুবকর। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি এ নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মেরাজকে তিনি সর্বপ্রথম অকপটে স্বীকার করেছিলেন বলে, রাসূল (সা) তাঁকে 'সিদ্দিক' বা 'সত্যবাদী' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তাঁর মধুর ব্যবহার এবং উদার দানশীলতার জন্য সমাজে তিনি 'আতিক' নামেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ওসমান। ডাক নাম কোহাফা। তিনি মক্কার বিজয়ের পর ইসলাম কবুল করেন। তাঁর মাতার নাম ছিল উম্মুল খায়ের সালমা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তিনি মুসলমান হন। তখন পর্যন্ত মাত্র ৩৯ জন ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

শৈশবকাল হতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি তাঁর এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বাল্যকালে তিনি মুহাম্মদ (সা)-এর খেলার সাথী ছিলেন। জাহেলী যুগে একমাত্র তিনি এবং মুহাম্মদ (সা) মদ স্পর্শ করেননি। বাল্যকাল হতেই তিনি তাঁর মধুর ব্যবহার, আতিথেয়তা, পরোপকার, দারিদ্রচিত্ততা এবং জ্ঞান-বিচক্ষণতার জন্য মশহুর ছিলেন। সে যুগে মক্কার যে কজন লেখাপড়া জানতেন। আবুবকর (রা) তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বংশপঞ্জী সম্বন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি কাপড়ের ব্যবসা করতেন। সম্ভবত তিনি কুরাইশ বংশের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন। তিনি ৪০,০০০ রৌপ্য মুদ্রার মালিক ছিলেন। তাঁর

ধন, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জন্য আরব সমাজে তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ও মর্যাদা সম্পন্ন লোক হিসেবে বিবেচিত ছিলেন।

মুহাম্মদ (সা) নবুয়ত দাবি করার সময় আবুবকর (রা) ব্যবসা উপলক্ষ্যে ইয়েমেন-এ ছিলেন। ব্যবসা শেষে তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলে আবুজেহেল, উতবা, শায়বা প্রমুখ কুরাইশ নেতা তাঁর সাথে দেখা করে মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আহ্বান জানায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল আবুবকর তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া তো দূরের কথা, উল্টো তিনি নিজেই মুসলমান হয়ে যান।

হিজরতের এক বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মে'রাজ শরীফ গমন করেন। মক্কাবাসীদের কাছে যখন মে'রাজের কথা উত্থাপন করা হল, তখন সবাই ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগল। আবুজেহেল এবং অপরাপর কাফেররা আবুবকর (রা)-এর কাছে এসে বলল, "আবুবকর! তোমার বন্ধুর কিছু হাল-হকিকত জান? তিনি এক অভিনব কথা বর্ণনা করেছেন। দোযখ-বেহেশত এমন কি আল্লাহ্র দর্শন পর্যন্ত লাভ করে আবার একই রাত্রে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। এবার তুমিই বল, এসব কি পাগলামি নয় ?"

হযরত আবুবকর (রা) আবুজেহেলের একথা শুনে বললেন, "যদি রাসূলুল্লাহ (সা) একথা বলে থাকেন, তাহলে তিনি ঠিকই বলেছেন। আমি এর প্রতিটি অক্ষরের সত্যতা স্বীকার করি। শুধু তাই নয়; বরং এর চেয়েও দূরের পথ অতিক্রম করা আর আসমানী সংবাদ আসার সত্যতা আমি অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করছি।"

হক ও বাতিলের সাথে যুদ্ধে আবুবকর সিদ্দীক (রা) যুদ্ধের ময়দানে সবার আগে থাকতেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে যাচ্ছিল। তা দেখে আবুবকর (রা) তৎক্ষণাৎ দৌড়ে এসে চাদরখানা তুলে নিয়ে তাঁর কাঁধে রেখে দিলেন এবং দ্রুতবেগে পুনারায় যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মোকাবিলায় চলে গেলেন। একবার তাঁর ছেলে আবদুর রহমান (যিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি) সামনে আসল, কিন্তু তাঁকে (আবুবকরকে) দেখে তরবারি নত করে অন্যদিকে চলে গেল। কিছুদিন পর সেই আবদুর রহমান ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা চলে আসেন। কথা প্রসঙ্গে একদা বলে ফেললেন, "আব্বাজন! বদর যুদ্ধে আপনি আমার তরবারির নীচে এসেছিলেন, কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় কিছু করিনি এবং অন্যদিকে চলে গিয়েছিলাম।' এর উত্তরে আবুবকর (রা) বলেন, "খোদার কসম! আমি তোমাকে তখন লক্ষ্য করিনি, নতুবা জীবিত ছাড়তাম না।"

তিনি ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর, ওহুদ, খন্দক যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া হুদায়বিয়ার সন্ধিতে তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। মক্কা বিজয়ের

পর হুনাইন এবং তায়েফের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি প্রত্যেক যুদ্ধেই অটল অবিচল থাকেন এবং অত্যাধিক বীরত্বের পরিচয় দেন।

মুহাম্মদ (সা)-এর ইন্তেকালের পর আকস্মিক মুসলমানরা শোক সাগরে নিমজ্জিত হল। কিন্তু ধীরস্থির এবং দৃঢ় চিত্তের অধিকারী আবুবকর (রা) এ বিরাট শোকভার বুকে ছেপে দূরদর্শিতার সাথে এর মোকাবেলা করেন। তা না হলে অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাফন-দাফনকার্য সম্পাদনের পূর্বেই খলিফা নির্বাচনের প্রশ্ন উঠল এবং এ নিয়ে বহু তর্ক-বির্তক চলতে লাগল। ফলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাফনকার্য দুদিন বিলম্বিত হল। এ দুদিনের মধ্যেই খলিফা নির্বাচনের কাজ সমাপ্ত হয়ে গেল এবং হযরত আবুবকর (রা) সর্বসম্মতিক্রমে খলিফা পদে নির্বাচিত হলেন।

খলিফা নির্বাচিত হবার পর আবুবকর (রা) সমবেত মুসলমানগণকে উদ্দেশ্য করে যে বাণী প্রদান করেন, তার কিয়দংশ নিচে উদ্ধৃত করা হল। তিনি ঘোষণা করেন– "হে মুসলমানগণ! তোমরা এখন আমাকে শাসনের গুরুভার প্রাপ্ত অবস্থায় দেখছ। কিন্তু তোমাদের অপেক্ষা আমি অধিক গুণসম্পন্ন নই। তোমাদের সকল প্রকার পরামর্শ ও সাহায্য আমার প্রযোজন। যদি আমি ভাল কাজ করি, তবে তোমরা আমাকে সমর্থন করবে, আর যদি ভুল করি তবে উপদেশ দিবে। শাসন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে সত্য কথা বললেই প্রকৃত আনুগত্য এর সত্য গোপন করাই বিদ্রোহের সামিল। দুর্বল ও সবল উভয়ই আমার দৃষ্টিতে সমান। উভয়ের প্রতি আমার বিচার সমান হবে। আমি যখন আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ পালন করি তখন তোমারও আমাকে মান্য করবে। আর যদি তা লংঘন করি, তাহলে তোমাদের আনুগত্যের বিন্দুমাত্র অধিকার আমার থাকবে না।"

এরূপে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে তিনি খলিফা হিসাবে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা জনগণকে অবহিত করান। ইসলামি রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়েও যে স্বেচ্ছাচারী হওয়া যায় না এবং বিচারে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য রচনা করা সম্ভব নয় তা তিনি পরিষ্কারভাবে বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মুহম্মদ আলী বলেন, "Each word of this splendid address contains volumes of wisdom and may well serve as a beacon light to the Muslim world...." অর্থাৎ, "অত্যুৎকৃষ্ট এ বক্তৃতার প্রতিটি শব্দই জ্ঞানসমৃদ্ধ এবং ইহা মুসলিম জাহানের কাছে আলোকের দিশারীস্বরূপ।"

খেলাফত লাভের পর আবুবকর (রা)-কে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। রাসূল (সা) ইন্তেকালের সংবাদে সমগ্র আরবদেশে বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা

আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। যে সমস্ত গোত্র সবেমাত্র পৌত্তলিকতা বর্জন করেছিল তারা পুনারায় মন্দ পথে ধাবিত হল এবং যে সমস্ত প্রবঞ্চক মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় দূরস্থ প্রদেশে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তখন তারাও মুসলমানদের উপর নানাভাবে অত্যাচার শুরু করল। অল্পদিনের মধ্যে ইসলাম ধর্ম মদীনা নগরীতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। আরব উপদ্বীপের প্রতিমা উপাসক যাযাবর সম্প্রদায়সমূহের বিরুদ্ধে এ একটি নগরকে পুনরায় যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হতে হল। এ প্রসঙ্গে জনৈক আরব ঐতিহাসিক বলেছেন– "The faithful were left like a flock of sheep without a shepherd, their prophet gone, their numbers few and their foes a multitude." অর্থাৎ "বিশ্বাসীগণ রাখালহীন মেষপালের মত বিচরণ করছিল, তাঁদের নবী নেই, তাঁরা সংখ্যায় অল্প এবং তাঁদের দুশমন দল সংখ্যাতীত।" আবুবকর (রা) সাহস ও দৃঢ়তার সাথে এ জটিল পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন।

মুহাম্মদ (সা)-এর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করতে এবং উত্তরাঞ্চলের প্রদেশসমূহে শান্তি স্থাপন করতে খলিফা হবার পরদিন হযরত আবুবকর (রা) উসামার নেতৃত্বে ৭০০ সৈন্যের এক বাহিনীকে উক্ত অভিযানে প্রেরণ করেন। মদীনার মুসলমানগণ দেশের ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য আবুবকর (রা)-কে তৎক্ষণাৎ বাইরে কোন প্রকার অভিযান প্রেরণ বন্ধ করতে অনুরোধ করলে আবুবকর (রা) দৃঢ়কণ্ঠে জবার দিলেন, "আমি কে যে আল্লাহর রাসূলের প্রেরিত অভিযান বন্ধ করব। মদীনা টিকে থাকুক কিংবা পতন হোক, খিলাফত স্থায়ী হোক বা ধ্বংস হোক মহানবীর (সা) আদেশ প্রতিপালিত হবেই।"

ঐতিহাসিক ফিলিপ কে. হিট্টি (Philip K. Hitti) বলেন, "The short Caliphate of Abu Bakr (632-34) was mostly occupied with the so-called riddah (secession, apostasy) wars," অর্থাৎ "আবুবকরের স্বল্পকালীন খেলাফতের বেশির ভাগ সময় 'রিদ্দা' (স্বধর্ম ত্যাগের) যুদ্ধে পরিপূর্ণ ছিল।"

রাসূলে করিম (সা) ওফাতের সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র একমাত্র হেজাজ প্রদশে ছাড়া প্রায় সমগ্র আরবদেশ নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্র ইসলাম ধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং কতিপয় ভণ্ড নবীর উদ্ভব হয়। সমগ্র আরবে অন্তর্বিপ্লব দেখা দেয় এবং মুসলিম আধিপত্যের চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য আরবীয় গোত্রগুলো বদ্ধ পরিকর হল।

হযরত আবুবকর (রা) কঠোর হস্তে সকল বিদ্রোহ দমন করেন। মুহম্মদ (সা)-এর জীবনের শেষদিকে আরবের বিভিন্ন অংশে কতিপয় ভণ্ডনবীর আর্বিভাব ঘটে। মুহাম্মদ (সা)-এর ইন্তেকালের পর তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে। ভণ্ড নবীদের মধ্যে ১. ইয়ামনের আসাদ আনসি, ২. মধ্য আরবের ইয়ামামার বানু হানিফা

গোত্রের মুসায়লামা; ৩. উত্তর আরবের বনি-আসাদ গোত্রের তালহা; ৪. মধ্য আরবের ইয়ারবু গোত্রের সাজাহ নামের এক নারীও নিজেকে নবী বলে দাবি করে। খলিফা আবুবকর (রা) সকল ভণ্ড নবীকে দমন করেন। তোলায়হা ও সাজাহ ইসলাম কবুল করে এবং মুসায়লামা ও আনসি পরাজিত ও নিহত হয়।

তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সারা আরবে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হয়। সেই জন্য ঐতিহাসিক মুহম্মদ আলী বলেছেন, "To him is due the credit of piloting the ark of Islam to a haven of safety in such a foul and stormy weather." অর্থাৎ "প্রতিকূল ঝড়সঙ্কুল আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে ইসলামের তরীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব একমাত্র তাঁর (আবুবকরের) প্রাপ্য।" খলিফা হওয়ার পূর্বে ও পরে সর্বপ্রকার অসুবিধা ও বিপদকে বরণ করে আবুবকর (রা) ইসলামের জন্য যে আত্মত্যাগ করে গিয়েছেন তা ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। তাঁর খেদমতে ইসলাম সঞ্জীবিত হয়ে উঠে এবং ঘোর বিপদ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।

সেজন্য ঐতিহাসিক মুইর বলেন, "But for (Abu Bakar) him, Islam would have melted away in compromise with the Bedouin tribes, or likelier still, would have perished in the throes of its birth." অর্থাৎ "তাঁর (আবুবকরের) জন্যই ইসলাম বেদুইন ধর্মের সাথে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি অথবা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়নি।"

অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করে তিনি মদীনার শিশু রাষ্ট্রকে বহিরাক্রমণের হাত হতে রক্ষা করেন। তিনি পারস্য ও বাইজান্টাইন সাম্রজ্যের মত দুইটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যকে পর্যুদস্ত করে ইসলামকে সম্ভাব্য বিপদের হাত হতে রক্ষা করেন। হযরত ওমর (রা)-এর শাসনকালে মুসলমানেরা যে দিগ্বিজয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন সে জয়ের সূচনা এবং পথপ্রদর্শন করেছিলেন হযরত আবুবকর (রা)। তাঁর স্বল্পকালীন খিলাফতাকালে শান্তি-শৃংখলা স্থাপন এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত শত্রুর মোকাবেলা করতেই ব্যয়িত হয়ে যায়। তথাপি প্রশাসন ক্ষেত্রে তিনি কতগুলো নীতি প্রতিষ্ঠা করেন যার উপর ভিত্তি করে ওমর (রা)-এর শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। তাঁর এ সমস্ত খেদমত ও ত্যাগের কথা বিবেচনা করে তাঁকে ন্যায়সঙ্গতভাবে Saviour of Islam বা ইসলামে পরিত্রাণকর্তা বলা হয়।

মক্কায় শ্রেষ্ঠ বিদ্বানদের অন্যতম ছিলেন হযরত আবুবকর। কুরআন ও হাদিসে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ছিল। জ্ঞানের দরজা হযরত আলী তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। আল্লাহ ও রাসূলের উপর তাঁর অবিচল বিশ্বাস ছিল। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, শান্তিতে-সংগ্রামে তিনি মহানবী (সা)-কে ছায়ার

মত অনুসরণ করেছিলেন। তাই রাসূলের জীবনাদর্শের বহু বৈশিষ্ট্য তাঁর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল। তাঁর ঈমানের দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়ণতা, অসীম ধৈর্য, অনুপম চরিত্র-মাধুর্য, কঠিন সংযম, বিপদে স্থিরচিত্ততা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের জন্য ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁর মহত্ত্বের ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বিবেচনা করে ঐতিহাসিক মুইর বলেছেন, "Had muhammad (Sm.) begun his career as a conscious imposter he never could have won the faith and friendship of a man who was not only sagacious and wise but throughout his life simple, consistent and sincere." অর্থাৎ "মুহম্মদ (সা)-এর মধ্যে যদি কপটতা থাকত তাহলে আবুবকরের মত সরল, বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান ও আত্মত্যাগীর বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব লাভ করতে পারতেন না, যিনি শুধু বিচক্ষণ ও জ্ঞানীই ছিলেন না, বরং সারাজীবন সরল ও নিষ্ঠাবান ছিলেন।" ঐতিহাসিক হিট্টিও তাঁর চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

হযরত আবুবকর ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা। তিনি দু'বছর তিন মাস খেলাফতের দায়িত্ব পালন করে প্রায় ৬২ বছর বয়সে মারা যান। তাঁর ললাট ছিল প্রশস্ত এবং তিনি দীর্ঘকায় ছিলেন। তিনি মুসলমান হওয়ার পূর্বে দু'বার এবং পরে দু'বার বিবাহ করেছিলেন। তাঁর তিন পুত্র এবং তিন কন্যা ছিল। পুত্রগণের নাম ছিল– আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান ও মুহম্মদ এবং কন্যাদের নাম ছিল আসমা, আয়েশা (হযরতের পত্নী) ও উম্মে কুলসুম।

তিনি ধর্মভীরু মুসলমান ছিলেন। তিনি কখনো নিয়মিত নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজ করতে পিছপা হতেন না। খলিফা আবুবকর তাঁর সত্যবাদিতা ও দানশীলতার জন্য রাসূল (সা)-এর কাছ হতে 'সিদ্দিক' এবং 'আতিক' উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি খলিফা হয়েও আড়ম্বরহীন জীবন-যাপন করতেন। তিনি দীন-দুঃখীর দুর্দশা দূর করার জন্য সর্বপথম 'বায়তুলমাল' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাতের অন্ধকারে গোপনে গোপনে খাদ্য সামগ্রী বহন করে গরীব ও অনাথদের দুরবস্থা ও অভাব মোচন করতেন। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, "Like his Master, Abu Baker was extremely simple in his habits; gentle but firm, he devoted all his energics to the administration of the new-born state and to the good of people." অর্থাৎ "তিনি তাঁর শিক্ষাদাতা মহাপুরুষের ন্যায় আচার-ব্যবহারে অত্যন্ত আড়ম্বরহীন ছিলেন। তিনি বিনীত অথচ দৃঢ় ছিলেন এবং নতুন রাষ্ট্রের শাসনকার্যে এবং জনসাধাণের উপকারার্থে তিনি সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন।"

খলিফা হবার পর তিনি প্রথমে নিজের ব্যক্তিগত আয়ের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন, কিন্তু এতে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের কাজে আত্মনিয়োগ করতে

না পারায় তিনি সাহারীগণের অনুরোধে বাৎসরিক ৬,০০০ দিরহাম গ্রহণে রাজি হন। কিন্তু মৃত্যুকালে 'বায়তুলমাল' হতে ঐ অর্থ গ্রহণ করায় এত কষ্টবোধ করছিলেন যে, তিনি তাঁর কিছু সম্পত্তি বিক্রয় করে সেই অর্থ পরিশোধ করতে আদেশ দেন। তাঁর আচার-ব্যবহার এরূপ সরল ও অকপট ছিল যে, হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা), হযরত আলী (রা) এবং আরো অনেক সাহাবী স্বয়ং মহানবীর পরে তাঁকে স্থান দিয়েছেন। ঐতিহাসিক মুইর এ প্রসঙ্গে আবুবকর (রা) সম্পর্কে যথার্থ মন্তব্য করেছিলেন, "আবুবকরের রাজত্বকাল সংক্ষিপ্ত হলেও মুহম্মদের (সা) পর আর কারো জীবনে তাঁর প্রচারিত জীবন বিধান এমন মূর্তরূপ পরিগ্রহ করেনি।"

তিনি গণতন্ত্রে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন এবং জনগণের মতানুসারে খেলাফতের কার্যাদি সমাধা করতেন। তাঁর কাছে খলিফা এবং একজন সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না। এ সম্পর্কে মুহম্মদ আলী বলেন, "The king was to be considered a member of society just as a commoner." অর্থাৎ "একজন সাধারণ মানুষের মত রাজা (খলিফা) সমাজের একজন সদস্য।" The king can do no wrong অর্থাৎ, "রাজা কোন অন্যায় করতে পারে না" এ মতবাদে খলিফা আবুবকর (রা) কখনো বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতে, আইনের চোখে একজন রাজা বা খলিফা এবং একজন কাঠুরিয়া বা ভিক্ষুক সমান। মাওলানা মুহম্মদ আলী বলেছেন, "In subordinating kingship to the law of the land and foundation of a truly democratic government as also of liberty and equality in the truest sense of words," অর্থাৎ "রাজাকে (খলিফাকে) দেশের আইনের অধীন এবং দেশের আইনকে জনসাধারণের ইচ্ছার অধীন করে এবং পূর্ণ স্বাধীনতা ও সমান অধিকার দান করে আবুবকর (রা) প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকারের গোড়াপত্তন করেন।"

হযরত আবুবকর (রা)-র আর একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল কুরআনের সূরাগুলোকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা। ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফিজ-ই-কোরান শহীদ হলে তিনি ঐশী বাণীসমূহকে পুস্তাকাকারে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ উদ্দেশ্যে জাযেদ-বিন-সাবেত নামক সাহাবীর নেতৃত্বে একটি সংকলন কমিটি গঠন করে লিপিবদ্ধ করেন। এরূভাবে লিপিবদ্ধ কুরআনের এক কপি তিনি হযরত ওমর (রা)-র কন্যা এবং রাসূল (সা)-এর স্ত্রী বিবি হাফসার কাছে আমানত রাখেন। হযরত আবুবকর (রা)-এর প্রদর্শিত পথ ধরে পরবর্তীকালে হযরত ওসমানের খেলাফতকালে কুরআন শরীফের নির্ভুল ও প্রমাণ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হচ্ছে ভণ্ড নবীদের এবং স্বধর্মত্যাগীদের আন্দোলন দমন। আবুবকর (রা) বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম পরিচালনা করে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্রকে রক্ষা করেছেন। যাকাত বিরোধী আন্দোলন দমন এবং পারস্যবাসী ও রোমানগণকে পরাজিত করে তিনি ইসলামের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন।

বস্তুতঃ মহানবীর ইন্তেকালের পর যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাতে আবুবকর (রা)-র মত একজন খলিফা না থাকলে ইসলাম ও ইসলামিক রাষ্ট্র কোনটাই রক্ষা পেত না। ইসলাম ধর্ম ও সমাজের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠত।

এক কথায় তিনি সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ, সুমহান শাসক ও সুযোগ্য সেনাপতি ছিলেন। হযরত আবুবকরের (রা) খেলাফতকাল স্বল্প পরিসরের হলেও ইসলামের ইতিহাসে তা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

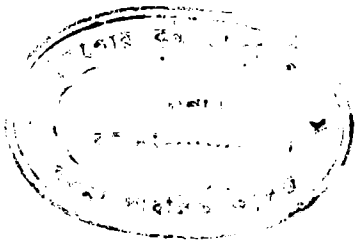

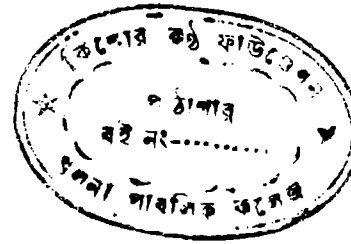

হযরত ওমর (রা)

ভৃত্য চড়িল উটের পিঠে ওমর ধরিল রশি
মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধূলায় নামিল শশী।

১৬ হিজরীর রজব মাসে যিনি একজন মাত্র ভৃত্য সমভিব্যাহারে একটি উট নিয়ে তাঁর চিরচরিত দীন পোশাকে জেরুজালেম রওয়ানা হন। পালাক্রম খলিফা ও ভৃত্য উটের পিঠে চড়ে জেরুজালেম পৌঁছলেন। শহরে উপস্থিত হওয়ার সময় ঘটনাক্রমে ভৃত্য উটের পিঠে এবং খলিফা রশি টানতে টানিতে শহরে প্রবেশ করেন। সর্বাধিনায়কের এ সর্বত্যাগী দৃশ্য দেখে খ্রিস্টানগণ বিস্মিত হয়ে বিনা দ্বিধায় জেরুজালেম নগরীর ভার যাঁর হাতে তুলে দেন। তিনিই ছিলেন অর্ধ পৃথিবীর শাসক আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা)।

আসল নাম ওমর ডাক নাস আবু হাকস। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ফারুক উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহার পিতার নাম খাত্তাব এবং মাতার নাম হানতামা বিনতে হিশাম ইবনে মুগীরা। পিতা-মাতা উভয়ের দিক হতেই হযরত ওমর (রা) ছিলেন অত্যন্ত প্রতাপশালী ব্যক্তির সন্তান। নবম পুরুষে গিয়ে তাঁর বংশধারা রাসূল (সা)-এর বংশের সহিত হয়েছে। বয়সের দিক দিয়ে তিনি রাসূল (সা)-এর চেয়ে তের বছরের ছোট ছিলেন। তিনি ৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত ওমর (রা) মাতাপিতার অত্যাধিক প্রিয় ছিলেন। সীমাহীন আদরের ভেতর দিয়ে তিনি লালিত-পালিত হন। তাঁর বয়স দশ বছর না হতেই দেশীয় নিয়ম অনুযায়ী তিনি ছাগল চরানোর মাঠে যাওয়া আরম্ভ করেন। সন্তানের জ্ঞান-বুদ্ধি দেখে পিতা তাকে উট চরানোর আদেশ করেন। কাদীদ নামক স্থানে তিনি সারাদিন উট চরাতেন। পিতা সুশিক্ষিত ছিলেন বিধায় তার কাছে তিনি লেখাপড়াও শিক্ষা করেন। সঙ্গে সঙ্গে তীর চালনা, কুস্তিগিরী এবং যুদ্ধবিদ্যায়ও তিনি নৈপুণ্য অর্জন করেন। বিশ বছর বয়সে তিনি কুস্তিগিরীতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ওকাযের বিখ্যাত বার্ষিক মেলায় তিনি কুস্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। লেখাপড়ার সাথে সাথে বংশ-পরিচয়ের জ্ঞান এবং

উচ্চমানের বক্তৃতাদানের ক্ষমতাও তিনি অর্জন করেন। বিশেষত এ উভয় বিদ্যায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

বংশগত নিয়মানুযায়ী তিনি সেই যুগে ব্যবসায়ের দিকেও মনোযোগী হন এবং ব্যবসায় উপলক্ষে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ ভ্রমণ করেন এবং অতি শীঘ্রই একজন সুপ্রসিদ্ধ বণিকরূপে পরিগণিত হন। তিনি ক্ষণজন্মা এক মেধাবী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি শুধু যে নিজের ব্যবসাকেই উজ্জ্বল এবং উন্নত করেন তাই নহে; বরং অনেক সময় মক্কাবাসীদের বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁকে দূত হিসাবেও কাজ করতে হত। কলহ-বিবাদের সময় তাঁকে বিচারক নিযুক্ত করা হত। তাঁর বিচার উভয়-পক্ষের জন্যই গ্রহণযোগ্য হত। তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি স্বীয় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধি-বিবেকের ফলে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ঐতিহাসিক বালাজুরি মতে, "জাহেলি যুগে কুরাইশ বংশে মাত্র সতের জন শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে হযরত ওমর অন্যতম ছিলেন।"

হযরত ওমর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। তিনি মক্কার ও কুরাইশ বংশের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে নবদীক্ষিত মুসলমানদের উপর অত্যাচার করতেন। তাঁর চাকরাণী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় তিনি তাঁর উপর নির্যাতন করেন। একদিন তিনি নাঙ্গা তলোয়ার হাতে নিয়ে রাসূল (সা)-কে হত্যার জন্য রওয়ানা হলেন। পথে জনৈক নঈম-বিন-আবদুল্লাহর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলে তিনি ওমরকে জিজ্ঞেস করেন, "কোথায় যাচ্ছ?"

ওমর উত্তরে বললেন, "মুহম্মদকে হত্যা করতে যাচ্ছি।"

নঈম বললেন, "আগে তুমি তোমার ঘর সামলাও। স্বয়ং তোমার ভগ্নিপতি সাঈদ এবং ভগ্নী ফাতেমা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।"

এ খবর শুনে তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ভগ্নীপতির বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। ওমরের আগমনের শব্দ শুনে তাঁর ভগ্নী ও ভগ্নীপতি কুরআন শরিফের যে অংশটুকু (সূরা ত্বা-হা) পাঠ করছিলেন তা লুকিয়ে ফেললেন। জিজ্ঞাসাবাদের পর ওমর যখন জানলেন যে, তারা বাস্তবিকই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন; তখন ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে প্রহার করতে করতে রক্তাক্ত করে ফেললেন। কিন্তু তবুও তাঁরা যখন কিছুতেই ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করতে রাজি হল না, তখন তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন, "আমি এখানে আসার পূর্বে তোমরা যা পড়ছিলে– আন তো দেখি, উহা কি?"

ভগ্নী সূরা 'ত্বা-হা' তাঁর হাতে এনে দিলে তিনি উহা পড়তে পড়তে মগ্ন হয়ে গেলেন এবং তাঁর মনে ভাবান্তর উপস্থিত হল। তিনি উন্মুক্ত তরবারি হাতেই ছুটে চললেন এবং সাফা পাহাড়ের পাদদেশে আরকামের বাড়িতে যেখানে মহানবী (সা) অবস্থান করছিলেন, সোজা সেখানে গেলেন।

ইতোমধ্যে হযরত মুহম্মদ (সা) পূর্বের বৃহস্পতিবার রাত্রে ওমর-বিন-খাত্তাব অথবা ওমর-বিন হিশামের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইসলামকে শক্তিশালী করার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন। ওমর হযরতের পদপ্রান্তে তরবারি রেখে কম্পিত কণ্ঠে বলেন, "হে আল্লাহর নবী আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করে নিন। যে তরবারি নিয়ে আপনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম, আজ হতে সেই তরবারি ওমরের হাতে ইসলামের শত্রু-নিধনে ব্যবহৃত হবে।" এরূপে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। নবুয়তের ষষ্ঠ বছরে ৩৩ বছর বয়সে হযরত ওমর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় মুসলমানগণ শক্তিশালী হলেন।

হযরত ওমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলমানগণ প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। রাসূল (সা)-এর আদেশে তিনি ২০ জন মুসলমানের এক কাফেলার সাথে মদীনায় হিজরত করেন। তাঁর প্রস্তাবে (যা পরবর্তীকালে ঐশী বাণী দ্বারা অনুমোদিত হয়) আযান ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। তিনি বদর, ওহুদ, খন্দক, হুনায়ন, খায়বার ইত্যাদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। খন্দকের যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্বে প্রদর্শন করেন। হোদায়বিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং এর বিরোধিতা করেন। হযরত (সা) তাঁকে এর পরিণাম মুসলমানদের পক্ষে শুভ বলে বুঝিয়ে বললে তিনি এতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

মক্কা বিজয়ের সময় তিনি কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ানকে বন্দী করেন। তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে তিনি তাঁর জীবনের সঞ্চিত অর্ধেক ধন-সম্পদ যুদ্ধ তহবিলে দান করেন। তাঁর খায়বার অঞ্চলের সম্পত্তিও ইসলামের খেদমতে তিনি দান করেন। রাসূল (সা)-কে তিনি এত বেশি ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন যে, হযরত (সা) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তিনি উন্মুক্ত পাগলের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। হযরত আবুবকর (রা) প্রথম খলিফা হিসাবে নির্বাচনের সময়ে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির অবসান ঘটান। আবুবকর (রা)-র খিলাফতে তিনি কাজীর কাজ করে সুনাম অর্জন করেন। তিনি আবুবকর (রা)-র প্রধান উপদেষ্টাও ছিলেন।

খিলাফত নিয়ে যাতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয় সেই জন্য আবুবকর (রা) তাঁর অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসলে আব্দুর রহমান, ওসমান, সাঈদ-বিন-যায়েদ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবীর সাথে আলাপ আলোচনা করে ওমর (রা)-কে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

হযরত ওমর (রা) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে আবুবকর (রা)-র বৈদেশিক রীতির অনুসরণ করেন। তিনি প্রথমতঃ দেশের অভ্যন্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তাঁর দশ বছরের শাসনকাল ইসলামের

ইতিহাসে অত্যন্ত রোমাঞ্চকর এবং দুঃসাহিসিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, "After the death of the prophet sterile Arabia seems to have been converted as if by magic into a nursery of heroes the like of whom both in number and quality is hard to find anywhere." অর্থাৎ "মহানবী (সা)-এর ওফাতের পর যেন যাদুমন্ত্রের ছোঁয়াচে অনুর্বর আরবদেশে অসংখ্য এবং অতুলনীয় যোদ্ধা উৎপাদনের ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হল যাদের সংখ্যা এবং গুণাবলীর সমকক্ষ আর কোথাও দেখতে পাওয়া দুষ্কর।"

খলিফা ওমর শুধু একজন রাজ্যজয়ী বীরই ছিলেন না, উপরন্তু তিনি একজন সুযোগ্য শাসনকর্তাও ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে তাঁর মত সুদক্ষ শাসক আর কেউই ছিলেন না। তিনি বিশ্বের শাসকদের নিকট আদর্শস্থানীয় ছিলেন। হযরত মুহম্মদ (সা) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামি সাধারণতন্ত্রের শাসন প্রণালীকে তিনি কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ মোতাবেক পরিপূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট রূপ দান করেন এবং উহাকে তিনি ইসলামের মূলমন্ত্র সাম্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। হযরত ওমরই ছিলেন ইসলামের রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন– "During the thirty years that the Republic lasted, the policy derived its character chiefly from Omar, both during his life time and after his death." অর্থাৎ "তিরিশ বছরের খিলাফত আমলে ওমরের জীবদ্দাশায় ও মৃত্যুর পরে উহার অনুসৃত নীতি প্রধানতঃ তাঁরই নিকট হতে উদ্ভূত হয়েছিল।"

জনগণের সমর্থন ও মঙ্গলের দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা এবং সকল এলাকার পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যে শাসন পদ্ধতি কায়েম করে গিয়াছেন তা সর্বদেশে সর্বকালে আদর্শ ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণযোগ্য। তাঁর রাজস্ব, সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও উন্নত ধরণের ছিল। ডক্টর এস. এম. ইমামুদ্দিন বলেন– "Omar's reign constituted a resplendent chapter in the history of the military achievements of Islam. He was not only a great conqueror but classed for all time, among the best of rulers and most successful of national leaders." অর্থাৎ "তাঁর শাসনকাল ইসলামের কৃতিত্বপূর্ণ সামরিক ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করেছে। তিনি শুধু একজন বিখ্যাত রাজ্যবিজেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক এবং নিরঙ্কুশ সফলকাম জাতীয় নেতাদের অন্যতম।"

সরকারের কার্যাদির সমালোচনা করতে ওমর জনসাধারণকে উৎসাহিত করতেন। এর ফলে যে-কোন শাসনগত ত্রুটি সঙ্গে সঙ্গেই সংশোধিত হত। ঐতিহাসিক মাওলানা মুহাম্মদ আলী বলেন, "Under Omar the principle of

Democracy was carried to a point to which it will yet take the world time to attain." অর্থাৎ "হযরত ওমরের সময় গণতন্ত্রের আদর্শ যতদূর বহন করা হয়েছিল সে আদর্শ অর্জন করতে বিশ্বের আরো সময় লাগবে।"

খলিফা ওমর ঘোষণা করেন যে, "পরামর্শ ব্যতীত কোন খিলাফত চলতে পারে না।" তাই তিনি জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী শাসনকার্যাদি পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রণা পরিষদ গঠন করেন। ইহাই 'মজলিশ-উশ-শূরা' নামে পরিচিত। এ পরিষদ আবার দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা– মজলিশ-উল-আম্ এবং মজলিশ-উল্-খাস্।

হযরতের সাহাবীগণ, মদীনার বিশিষ্ট নাগরিক এবং বিশিষ্ট বেদুইন প্রধানগণকে নিয়ে মজলিশ-উল্-আম্ গঠিত হত। মদীনার মসজিদে এর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হত। এজন্য অধিবেশকালে মসজিদে উপস্থিত যে কোন মুসলমান মজলিশ-উল্-আমের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারত। দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদনের জন্য খলিফা মজলিশ-উল্-খাসের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। অতি অল্পসংখ্যক বিশিষ্ট মোহাজিরীন নিয়ে মজলিশ-উল্-খাস্ গঠিত ছিল। হযরত আলী (রা), হযরত ওসমান (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত যুবায়ের (রা) প্রমুখ সদস্যের সমন্বেয়ে এটি গঠিত ছিল। কর্মচারী, সৈনিক, শাসনকর্তা, বিচারক প্রভৃতি নিয়োগ ও বদলী ইত্যাদি রাষ্ট্রের খুঁটি-নাটি ব্যাপারে খলিফা মজলিশ-উশ-শূরার মতামত গ্রহণ করতেন এবং সেই মোতাবেক শাসন কার্যাদি পরিচালনা করতেন। খলিফা ওমর নিজের ইচ্ছানুযায়ী কিছুই করতেন না।

খলিফা ওমর শাসনব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ করে খিলাফতের দূরতম এলাকারও সুষ্ঠু শাসনের ব্যবস্থা করেন। সাম্রাজ্যের বিশালতা হেতু তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। যথা– ১. মক্কা, ২. মদীনা, ৩. আল-জাজিরা, ৪. সিরিয়া, ৫. আল-বসরা, ৬. আল-কুফা, ৭. মিসর, ৮. প্যালেস্টাইন, ৯. ফারস, ১০. কিরমান, ১১. খোরাসান, ১২. মাকরান, ১৩. সিজিস্তান এবং ১৪. আজরাবাইজান।

ওমর (রা)-এর রাজস্ব-সংস্কার ছিল বৈপ্লবিক। শিব্‌লী নোমানী বলেন, "The greatest reform, which was in fact a revolution which Omar effected in revenue administration. ..... was the abolition of the oppressive agrarian system that had prevailed in the conquered countries before Islam." অর্থাৎ "ওমরের (রা) বৈপ্লবিক রাজস্ব সংস্কারের সর্বোৎকৃষ্ট দিক হল ইসলামের অনুপ্রবেশের পূর্বে বিজিত দেশসমূহে নির্যাতনমূলক কৃষি ব্যবস্থার বিলোপ সাধন।" তিনি সমগ্র দেশে একই ধরণের ইসলামি আইনানুসারে প্রযোজ্য এক সুমহান এবং ন্যায়সঙ্গত রাজস্ব প্রবর্তন করেন। বিজিত দেশসমূহে পূর্বের প্রবর্তিত নির্যাতনমূলক কর ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করেন।

খলিফা ওমরের খেলাফতে ছয় প্রকারের রাজস্ব ছিল। যথা– ১. যাকাত (দরিদ্র কর), ২. জিজিয়া (নিরাপত্তামূলক সামরিক কর), ৩. গণিমাহ (যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি). ৪. খারাজ (ভূমি কর), ৫. আলফে (রাষ্ট্রের খাস জমির আয়), ৬. উশুর (বাণিজ্যিক দ্রব্যাদি হতে আদায়কৃত কর)। রাজস্ব সংক্রান্ত আইন-কানুন স্বয়ং মহানবী (সা) নির্ধারণ করে যান।

খলিফা ওমর (রা)-র বায়তুলমাল (রাজকীয় কোষাগার)-এর পুনর্গঠন আর একটি শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। খিলাফতের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে খলিফা দিওয়ান-উল-খারাজ নামক একটি নতুন রাজস্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এর কাজ ছিল রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ রক্ষা করা।

এ ভাতাভোগী তালিকা সম্বন্ধে এতিহাসিক মুইর বলেন, "The pension system of Omar is a spectacle probably without parallel in the world." অর্থাৎ "ওমর (রা)-র প্রবর্তিত ভাতাভোগীদের বৃত্তি তালিকা সম্ভবতঃ দুনিয়ার বুকে তুলনাবিহীন।" এ তালিকা এত ব্যাপকভাবে তৈরি করা হয় যে, "প্রত্যেক গোত্রের প্রত্যেকটি ব্যক্তি এতে অন্তর্ভুক্ত হল। এ ছাড়াও খিলাফতে বসবাসকারী সকল পঙ্গু, দুর্বল, অক্ষম, ব্যক্তিদের জন্য বায়তুলমাল হতে বিশেষ ভাতাদানের ব্যবস্থা ছিল। আনেক ক্ষেত্রে অনেক অমুসলমানও এই ভাতাপ্রাপ্তি হতে বঞ্চিত ছিল না। এরূপভাবে সুষ্ঠু বণ্টনের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রের ধন-সম্পত্তিতে প্রত্যেক নাগরিকের ন্যায্য অধিকার ও অংশ ছিল। জনগণের সামগ্রিক মঙ্গল কামনায় এরূপ প্রচেষ্টা জগতের বুকে মহামতি ওমর (রা)-ই সর্বপ্রথম করেছেন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক মুইর তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'The Caliphate' -এ লিখেছেন, "A people dividing amongst them the whole revenues, spoils and conquests of the state, on the basis of an equal brotherhood, is a spectacle probably without parallel in the world." অর্থাৎ "আরব জাতির মত ভ্রাতৃত্বের সমতার ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ রাজস্ব, গণিমাহ্ (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) এবং বিজিত স্থানসমূহের বণ্টন প্রথা সম্ভবত বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন।"

রাজনৈতিক বিভাগ ছাড়াও সামরিক শাসনের সুবিধার জন্য এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখার জন্য হযরত ওমর (রা) সমগ্র সাম্রাজ্যকে নয়টি সামরিক জেলায় (আল্-জুন্দ্) বিভক্ত করেন। যথা– ১. মদীনা, ২. কুফা, ৩. বসরা, ৪. ফুসতাত, ৫. মিসর, ৬. দামেশক, ৭. হিমস্, ৮. প্যালেস্টাইন এবং ৯. মসুল। প্রত্যেক জুন্দে সর্বদা ৪,০০০ অশ্ব মজুত থাকত এবং অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ৩৬,০০০ অশ্বারোহীকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। তাঁর আমলে সৈন্যগণ প্রত্যেকে প্রথম বছরে ২০০ ও পরে ৩০০ দিরহাম

বেতন পেত। তাদের খোরাক ও পোশাক বিনামূল্যে সরবরাহ করা হত। তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণ সরকার হতে ভাতা পেত।

ওমর (রা) প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে প্রধান কাজী এবং প্রত্যেক জেলায় একজন করে সাধারণ কাজী নিযুক্ত করেন। স্বাধীন, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সুস্থ ও পূর্ণ বোধশক্তি সম্পন্ন, শরিয়তে পণ্ডিত ও মুসলমান ব্যক্তিকে বিচারক হিসাবে নিযুক্ত করা হত। সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচারের জন্য এবং অন্য বিভাগের হস্তক্ষেপ হতে প্রভাবমুক্ত করার জন্য হযরত ওমর (রা) ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ মন্টেস্কুর বহুপূর্বে বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগে উন্নীত করেন। মসজিদ গৃহ বিচারালয় হিসাবে ব্যবহৃত হত। কাজীরা উচ্চ-নিচ, ছোট-বড় ভেদাভেদ না করে নির্ভীকভাবে নিরপেক্ষ ও ন্যায় বিচার করতেন।

ওমর তাঁর শাসনকালে ৪,০০০ নতুন মসজিদ, অসংখ্য দুর্গ ও সেনানিবাস সরকারি কার্যালয়, পুল, বড় বড় রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণ করেন। ভূমির উর্বরতা বাড়াবার জন্য এবং পানীয়কষ্ট নিবারণের জন্য বসরায় আবু মূসা খাল, ইরাকে মা'কিল খাল, পারস্যে সা'দ খাল এবং মিসরে আমিরুল মুমেনিন খাল খনন করেন। তিনি মদীনা মসজিদের সম্প্রসারণ এবং কা'বা গৃহের পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি বসরা, কুফা, ফোসতাত, মাসুল, জাজিরা প্রভৃতি বিখ্যাত নগর নির্মাণ করেন। তিনি হিজরী সনের প্রবর্তন করেন।

দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, আইন-কানুন, অভাব ইত্যাদি অবগত হবার জন্য খলিফা নিজে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন এবং প্রয়োজন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। হজ্বের সময় খলিফার কাছে সাধারণ লোক দুর্নীতি পরায়ণ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করার সুযোগ পেত। খলিফার ভয়ে কোন সরকারি কর্মচারী দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে সাহস পেত না। এক কথায় জনসাধাণের কল্যাণই ছিল হযরত ওমরের প্রবর্তিত শাসনের মূল লক্ষ্য।

হযরত ওমর (রা) প্রাক-ইসলামিক যুগে এবং ইসলাম গ্রহণের পর কয়েকটি বিয়ে করেন। তাদের নাম যথাক্রমে–

১. বিবি যয়নব তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং হিজরতের পূর্বেই মক্কায় ইন্তেকাল করেন।

২. ক্বারীবা বিন্‌তে আবি উমাইয়া মখ্‌যুমী। তিনি ইসলাম গ্রহণ না করায় হযরত ওমর (রা) তাকে তালাক দেন।

৩. উম্মে কুলসুম। তিনিও ইসলাম না করায় তালাক প্রাপ্ত হন।

৪. জামীলা বিন্‌তে আছিম। তিনিও বিশেষ কারণে তালাক প্রাপ্ত হন।

৫. উম্মে কুলসুম বিন্‌তে আলী তিনি হযরত ফাতেমা (রা)-এর কন্যা। তাঁর গর্ভে ফাতেমা ও যায়েদ জন্মগ্রহণ করেন।

৬. আতিকা বিন্‌তে যায়েদ। তিনি হযরত ওমর (রা)-এর চাচাত বোন।

এছাড়া হযরত ওমর উম্মে হাকীম বিনতে হারিস, ফাকীহা প্রভৃতি স্ত্রীলোকদিগকেও বিয়ে করেন।

কন্যাদের মধ্যে হযরত হাফছা (রা)-র নাম চিরস্মরণীয়। তিনি ৩য় হিজরীতে মুহাম্মদ (সা)-এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পুত্রদের মধ্যে আব্দুল্লাহ, উবায়দুল্লাহ, আছেম, আবুশাহমা, আবদুর রহমান, যায়েদ, মুজীর। হযরত আবদুল্লাহ পিতার সহিত মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম বোখারী ও মুসলিম তাঁর সনদে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত ওমর (রা) ১০ বছর ২ মাস খিলাফতে অধিষ্ঠিত থেকে ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে মদীনার মসজিদে নামাজরত অবস্থায় আবুলুলু ফিরোজ নামক খ্রিস্টান পারসিক কর্তৃক ছুরিকাহত হয়ে শাহাদাতবরণ করেন। ফিরোজ একজন পারসিক যুদ্ধবন্দী ছিল। সে হরমুজান ও জাফিনা নামক মদীনার দু'জন যুদ্ধ বন্দীর যোগসাজশে খলিফাকে ছুরিকাঘাত করে।

হযরত ওমর (রা) তাঁর চরিত্রের মাধুর্য এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের দ্বারা শুধু মুসলিম জাতির ভবিষ্যৎই গড়ে তোলেন নি, তাঁদের নিজস্ব ইতিহাসও সৃষ্টি করিয়াছেন। হযরত ওমর (রা) ছিলেন সচ্চরিত্রের সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি ছিলেন ত্যাগী, অনাড়ম্বর, সরল ও সুকঠিন। অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামই ছিল তাঁর চরিত্রের মূলমন্ত্র। তাঁর চরিত্রে কোমলতা এবং কঠোরতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। খিলাফত লাভের পূর্বে তিনি ছিলেন যেমন কঠোর, খিলাফত লাভের পর তেমনি কোমল হয়েছিলেন। অজস্র ধনরত্ন তাঁর পদপ্রান্তে পড়েছিল; কিন্তু সে-সবের প্রতি তিনি কোনদিন লোভ করেননি। বাস্তবিকই তাঁর সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ছিল বিশ্বের বিস্ময়স্বরূপ। এত বড় সাম্রাজ্যের খলিফা হয়েও একজন সাধারণ প্রজার মত বায়তুল মাল হতে তিনি দৈনিক মাত্র দুই দিরহাম পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। গাত্রাবরণ করতে তাঁর বহু তালিবিশিষ্ট একটি মাত্র জামাই ছিল। তাঁর প্রধান খাদ্য ছিল সামান্য রুটি বা খেজুর। কদাচিৎ তিনি গোশত ও জলপাই-এর তেল আহার করতেন।

তিনি সর্বদা প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচন এবং সুখ-শান্তি বিধানে মগ্ন থাকতেন। তিনি রাতের আঁধারে ছদ্মবেশে পথে-প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করতেন। খলিফা অনেক সময় স্বয়ং আটার বস্তা মাথায় করে বহন করে দুঃখী প্রজার গৃহে পৌঁছে দিতেন, কখনো বা প্রসূতির প্রসব যাতনা নিবারণার্থে তাঁর বিবিকে কোন দরিদ্র বেদুইনের গৃহে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতেন। দরিদ্র ও অসহায়ের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও সহানুভূতি

পরায়ণ। অমুসলিম প্রজাদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত দরদী। তিনি তাদের দর্শানুষ্ঠানের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন এবং তাদের জানমালের নিরাপত্তার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। পর ধর্মের প্রতি তিনি উদার ছিলেন।

বিচার ব্যবস্থায় তিনি ছিলেন অতি কঠোর। তিনি বিশ্বাস করতেন– Law is on respected of person. অর্থাৎ আইন কারো খাতির করে না। বিচারে তাঁর নিকট মুসলিম-অমুসলিম, উচ্চ-নিচু, আপন-পর সবাই সমান ছিল।

এত বড় খলিফা হয়েও তিনি ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য কোন দেহরক্ষী রাখেননি কিংবা নিজের জন্য কোন আড়ম্বরপূর্ণ শাহী বালাখানাও নির্মাণ করেননি। ইসলামের, রাষ্ট্রের ও জনগণের খেদমতে তিনি তাঁর সমগ্র উদ্যম, সময় ও মস্তিষ্ক সর্বদা নিয়োজিত রেখে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাঁর সম্বন্ধে উইলিয়াম মুইর বলেন, "Omar's life requires but a few lines to sketch : Simplicity and duty were the guiding principles of his life, impartiality and devotion the leading features of his administration," অর্থাৎ "ওমরের জীবন-চরিত অল্প কথায় আঁকা যায়। সরলতা এবং কর্তব্যপরায়ণতা তাঁর জীবনাদর্শ ছিল এবং ন্যায়পরায়ণতা ও একাগ্রতা তাঁর শাসনের মূলনীতি ছিল।"

ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে তিনি বিদ্বান ও বাগ্মী হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কুরআন ও হাদিসে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। প্রায় ১০০০ ফিকাহ্ সংক্রান্ত মাসলা সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, পরবর্তী ফকিহরা তা সমর্থন করেছেন। তাঁর কর্মদক্ষতা এবং বহুমুখী প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং রাসূল (সা) একদা বলেছেন যে, তাঁর পর কেহ নবী হলে সেই পদ ছিল একমাত্র ওমরেরই প্রাপ্য। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হিট্টি বলেন, "In fact Omar, whose name according to Mo... tradition is the greatest in early Islam after that of Moh... s been idolized by Moslem writers for his pie... archal simplicity and treated as the ... rtues a caliph ought to possess. His ... ne an exemplar for all conscientious ... প্রকৃতপক্ষে মুসলিম কিংবদন্তীতে প্রাথমিক ... রত মুহম্মদ (সা)-এর পরেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ... দের দ্বারা তাঁর দান, বিচার এবং অসামান্য ... দের মতে, একজন খলিফার যে সমস্ত গুণ ... ছিল। তাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্র সমস্ত ধর্মভীরু

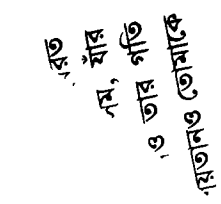

শুধু তাঁর চরিত্র-মাধুর্যের জন্য নয়, বিখ্যাত বিজেতা, কীর্তিমান শাসক এবং বৈপ্লবিক সংস্কারক হিসাবে তিনি সমসাময়িক এবং পরবর্তী ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। মাত্র ১০ বছরের মধ্যে তাঁর রণনৈপূণ্য এবং যোগ্যতার জন্য বিশাল পরক্রামশালী রোমক ও পারস্য সাম্রাজ্যদ্বয়কে আঘাতের পর আঘাত হেনে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ব করা সম্ভবপর হয়। এ বিষয়েও ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টির মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, The conquest of the world receiving its impulse under Abu Baker reached its high water-mark under Omar.....starting with nothing the Moslem Arabian caliphate had now grown to be the strongest power of the world." অর্থাৎ "আবুবকরের সময় বিশ্ববিজয়ের উদ্দীপ্ত প্রেরণা ওমরের সময় পরিপূর্ণতা লাভ করে। ..... শুধু শূন্যতা নিয়ে শুরু করে ওমর মুসলমানদের আরব সাম্রাজ্যকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে উন্নীত করেন।" শুধু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেই তিনি ক্লান্ত হননি, গোটা সাম্রাজ্য এক সুষ্ঠু শাসন পদ্ধতি প্রবর্তন করে তিনি দুনিয়ার বুকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে ইসলামের রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। শরিয়াতের আইন প্রবর্তন, সামরিক ও পুলিশী ব্যবস্থার প্রবর্তন, আদম শুমারি, ভাতা দান ব্যবস্থা, হিজরী সন গণনার প্রবর্তন করে, রাজস্ব ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদির সংস্কার সাধন করে এবং অমুসলমান প্রজাদের জানমাল ও ধর্মের হিফাজত ও স্বাধীনতা প্রদান করে, আরবীয় মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার সুব্যবস্থার প্রবর্তন করে, মুসলমানদেরকে দাসত্বে আবদ্ধ করা বন্ধ করে এবং অরব-উপদ্বীপে ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করে তিনি সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম বলে গণ্য হতে পেরেছেন। তাঁর শাসন ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে।

তিনি ছিলেন গণতন্ত্রে পূর্ণ বিশ্বাসী। জনসাধাণের মতকে তিনি অগ্রাধিকার দান করতেন। বস্তুতঃ মহানবী মদীনায় গণতন্ত্রের যে বীজ বপন করেন, তা ওমরের ঐক্য, সাম্য ও মৈত্রীর বিলষ্ঠ আদর্শে এক শক্তিশালী মহীরুহে পরিণত হয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষেই ওমর (রা) ছিলেন জনগণের খলিফা এবং 'আমিরুল মুমেনীন' বা বিশ্বাসীদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা।

বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযী শরীফে আছে। একদা রাসূল (সা) হ
ওমরকে দেখে বললেন, "হে খাত্তাবের ছেলে! সেই পাক জাতের ক
হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমাকে আসতে দেখলে শয়তান
পরিবর্তন করে নেয়।" আর একবার বলেছিলেন, "হে ওমর!
ভয় করে।"

বোখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মগণের মধ্যে কিছু লোক এমনও ছিল, আল্লাহ্ পাক যাদের সাথে কথা বলতেন। আমার উম্মতে সেরূপ যদি কেহ থাকে, তাহলে তিনি হলেন হযরত ওমর (রা)।"

আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে আছে, রাসূল (সা) বলেন, "আল্লাহ্ পাক হযরত ওমর (রা)-এর মুখে এবং অন্তরে হক কায়েম করেছেন।" অপর এক রেওয়ায়তে বলেছেন, "আল্লাহ্ পাক হযরত ওমরের মুখে হক রেখেছেন।" অন্যত্র বলেন, "আমার পরে যদি কেহ নবী হত, তা হলে ওমরই হত। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী হবে না।"

তিরমিযী শরীফের বর্ণনা থেকে জানা যায় রাসূল (সা) বলেন, আমি বেহেশতে গিয়ে স্বর্ণ নির্মিত একটি প্রসাদ দেখে জিজ্ঞেস করলাম, "এটি কার জন্য তৈরি করা হয়ছে।" ফেরেশতারা বললেন, 'ওমর ইবনে খাত্তাবের জন্য।'

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) এবং হযরত ওমর (রা)-কে উদ্দেশ্য করে একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "তোমরা উভয়ে কোন পরামর্শে একমত হলে আমি তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করব না।" (ইমাম আহমদ)

রাসূল (সা) বলেন, "কেয়ামতের দিনে সর্বপ্রথম আমি যে ব্যক্তির সহিত মোসাফাহা করব এবং ফেরেশ্তাগণ হাতে ধরে যাঁকে বেহেশতে নিয়ে যাবে, তিনি হলেন ওমর (রা)।" (মোস্তাদরাকে হাকেম)

হযরত ওমর (রা) দিগ্বিজয়ী খলিফা হবেন এ সম্পর্কে রাসূল (সা) পূর্বেই ইঙ্গিত করেছিলেন। যেমন মেশকাত শরীফের হাদীসে আছে, রাসূল (সা) বলেছেন, "অমি স্বপ্নযোগে আজ এক প্রত্যাদেশ লাভ করেছি। আমি দেখলাম যেন একটা বালতি দ্বারা কূপ থেকে পানি উঠিয়ে মানব জাতিকে তৃপ্ত করছি। বহুক্ষণ যাবত আল্লাহ পাকের ইচ্ছানুযায়ী পানি উঠালাম। অতঃপর আবুবকর সেই বালতি ধরলেন। আবুবকর মাত্র দু'তিন বালতি পানি তুললেন। আল্লাহ আবুবকরকে রক্ষা করুন তাঁর (আবুবকরের) হাতে দুর্বলতার চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠল। সবশেষে ওমর বালতি নিল। কি আশ্চর্য! ওমরের হাতে সেই বালতি বিরাট মশকে পরিণত হল। সেই মশক দিয়ে ওমর দুনিয়াবাসীকে অবিরাম পানি বিতরণ করতে লাগলো। ওমর এত পানি বিতরণ করলে যে, দুনিয়ার কারো আর পানির অভাব রইল না। ওমরের হাতে সকলের প্রয়োজন মিটে গেল।"

হযরত ওসমান (রা)

তাবুক যুদ্ধের জন্যে যিনি এত অধিক পরিমাণে অর্থ সাহায্য করেন যে, রাসূল (সা) তাঁর দেয়া স্বর্ণমুদ্রা একহাত হতে অন্য হাতে রাখতে রাখতে বলছিলেন, 'আজ হতে ওসমান কোন কাজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।' তিনিই ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)। তিনি জন্মগতভাবেই লজ্জাশীল এবং সচ্চরিত্রবান ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি কখনো সে রকম অপকর্ম করেননি, যা আরবদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। যেমন মদ পান, জুয়া, ব্যাভিচার, লুটতরাজ ইত্যাদির কোনটাতেই তিনি অংশগ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন একজন ভাল উপদেশ দাতা এবং তাঁর নেক কাজ গ্রহণের যোগ্যতা ছিল অপরিসীম।

হযরত ওসমান (রা) ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে) কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ এবং রাসূলুল্লাহর পূর্বপুরুষ এক ও অভিন্ন ছিল।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর ডাক নাম ছিল আবু আমর এবং আব্দুল্লাহ। তাঁর পিতার নাম ছিল আফ্ফান এবং মাতার নাম আরওয়াহ্। ছোটবেলা হতেই তিনি নম্র ও চরিত্রবান ছিলেন। তিনি লেখাপড়াও জানতেন। তিনি ব্যবসায়ী এবং ধনশালী ছিলেন বলে 'গণি' (ধনী) নামে পরিচিত ছিলেন। আবুবকর (রা) এবং ওমর (রা) তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

রাসূল (সা) যখন ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৫ বছর। এক রাতে হযরত ওসমান স্বপ্নে এক অজ্ঞাত শক্তির দ্বারা আদিষ্ট হলেন– "ওগো ঘুমন্ত ব্যক্তি, জেগে ওঠো, মক্কায় আহমদ আগমন করেছেন।" অনতিবিলম্বে তিনি রাসূল (সা)-এর কাছে গিয়ে ইসলাম কবুল করেন। এ সংবাদ শুনে চাচা হাকাম তাঁকে রশি দিয়ে একটি খুঁটিতে বেঁধে প্রহার করেন এবং ইসলাম ত্যাগ করতে বলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই ইসলাম ত্যাগ করতে রাজি হননি। তিনি রাসূল (সা)-এর দু' কন্যা রোকেয়া এবং উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করে 'জুন-নুরায়েন' খেতাব অর্জন করেন।

কুরাইশগণের অমানুষিক অত্যাচার এবং জুলুমের হাত হতে মুসলমানগণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মহানবী (সা) কতিপয় মুসলমানকে আবিসিনিয়ায় হিজরত

করতে উপদেশ দেন। হযরত ওসমান এবং তাঁর স্ত্রী রোকেয়া একদল মোহাজেরের সাথে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে দু' বছর থাকার পর মক্কায় ফিরে এসে তিনি পুনরায় মদীনায় হিজরত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মিলিত হন।

মদীনায় অবস্থানকালে ইসলামের খেদমতে তিনি তাঁর ধন-সম্পত্তি অকাতরে দান করেন। এক্ষেত্রে হযরত আবুবকরের পরেই তাঁর স্থান। মদীনায় যখন মুসলমানগণ পানীয় জলের অভাবের সম্মুখীন হন, তখন মহানবী (সা)-এর ইঙ্গিতে মদীনার একমাত্র পানীয় জলের কূপ বীর রুমা ২০,০০০ দিরহাম ব্যয়ে তিনি ক্রয় করে রাসূল (সা) ইচ্ছা পূরণ করেন। মদীনার মসজিদের সংশ্লিষ্ট জমি ক্রয় করে রাসূল (সা)-এর মদীনায় মসজিদ সম্প্রসারণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, তিনি সেই জমিও ক্রয় করে রাসূল (সা)-এর ইচ্ছা পূরণ করেন। তাবুক অভিযানের ব্যয় বহনের জন্যও তিনি নগদ ১০০০ দিনার এবং ১০০০ উট ও ৭০টি ঘোড়া এবং সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশের ব্যয়ভার বহন করেন। একমাত্র বদরের যুদ্ধ ছাড়া তিনি রাসূল (সা)-এর জীবদ্দশায় অনুষ্ঠিত সব যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্র নির্দেশেই তাঁর স্ত্রী রোকেয়ার অসুস্থতার জন্য তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তিনি মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে কুরাইশদের সাথে শান্তি আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। আবু বকর (রা) এবং ওমর (রা)-এর খিলাফতকালে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে তিনি তাঁদেরকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ওমর (রা) মুসলিম জাহানের ভাবী উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ভার হযরত ওসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত যুবায়ের (রা), সা'দ (রা) ও আব্দুর রহমান-বিন-আ'উফ (রা)-কে নিয়ে গঠিত এক পরিষদের উপর ন্যস্ত করে যান। তাঁরা প্রত্যেকেই রাসূল (সা)-এর প্রিয় সহচর ছিলেন এবং ইসলামের খেদমতে তাঁদের প্রত্যেকেরই অসামান্য দান ছিল। আবুবকর এবং ওমর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন বলে তাঁদের নির্বাচন সমস্যা জটিল আকার ধারণ করেনি, জনসাধারণ সহজেই তাঁদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু এবারের খলিফা নির্বাচন সত্যিকারেই জটিল আকার ধারণ করল। কেননা তাদের মধ্যে কেউই বিরাট ব্যক্তিত্বের দ্বারা অপর কারো চেয়ে বড় ছিলেন না। আবু-ওবায়দা (রা) জীবিত থাকলে হয়ত তিনি তৃতীয় খলিফা মনোনীত হতেন, কিন্তু তিনি খলিফা ওমরের খিলাফতকালে মারা যান। তাঁর উপর খলিফা ওমরের নির্দেশ ছিল যে, তিনি মারা যাওয়ার তিনদিনের মধ্যেই যেন খলিফা নির্বাচন করা হয়।

আবদুর রহমান (রা) জনগণের সবচাইতে বেশি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণও ছিলেন। কিন্তু খিলাফতের গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ করতে

তিনি রাজি ছিলেন না। হযরত ওসমান (রা) সত্তর বছরের বৃদ্ধ হলেও ইসলামের খেদমতে অকাতরে দান করেন এবং রাসূল (সা)-এর দুই কন্যাকে বিয়ে করে জুন-নুরাইন খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। অপরপক্ষে হযরত আলী (রা)-ও রাসূল (সা)-এর জামাতা এবং চাচাত ভাই ছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষায় ও শৌর্যবীর্যে তিনি মুসলিম সমাজের গৌরবের পাত্র ছিলেন। ইসলামের জন্য হযরত তাল্‌হা (রা) এবং হযরত যুবায়ের (রা)-এরও যথেষ্ট দান ছিল। পারস্য বিজয়ী বীর হযরত সা'দ (রা)-এরও ইসলামের জন্য ত্যাগ ছিল অসামান্য। তাঁদের মধ্যে হযরত তাল্‌হা (রা) তখন মদীনায় উপস্থিত ছিলেন না। বাকি পাঁচজন সদস্য মদীনায় উপস্থিত থেকে নির্বাচনী প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন।

অপ্রীতিকর ও সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হলে আবদুর রহমান (রা) সালিশ হিসাবে মধ্যস্থতা করে এ গুরুতর সমস্যার সমাধান করতে সচেষ্ট হলেন। যোবায়ের (রা) ওসমান (রা) ও আলী (রা)-র নাম প্রস্তাব করেন। সা'দ (রা) ওসমান (রা)-কে সমর্থন জানান। আলী (রা) ওসমান (রা)-কে এবং ওসমান (রা) আলী (রা)-কে সমর্থন জানান। কিন্তু আলী (রা)-র সমর্থন দ্বিধাজড়িত ছিল এবং তিনি আরো বলেন যে, তিনি আত্মীয়-স্বজনের কথার মূল্য না দিয়া শুধু অধিকার ও জনমতের দাবি স্বীকার করবেন।

এমতাবস্থায় আবদুর রহমান (রা) প্রত্যেকের বাড়িতে যাতায়াত করে প্রত্যেকের মতামত যাচাই করে হযরত ওমর (রা)-র মৃত্যুর চতুর্থ দিনে হযরত ওসমানকে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন। আনসার, মোহাজিরগণ এবং অন্যান্য উপস্থিত সকলেই ওসমানের নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। এরূপে ২৪ হিজরীর ১লা মহররম হযরত ওসমান (রা) মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। পরে হযরত তালহা (রা) মদীনায় উপস্থিত হলে হযরত ওসমান (রা) তাঁকে খলিফাপদ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি এতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং ওসমান (রা)-র নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

হযরত ওসমান (রা) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর রাজ্য শাসনের জন্য নতুন কোন পন্থা অবলম্বন করেননি। তিনি সে পন্থা অনুযায়ীই খেলাফতের কাজ সমাধা করেন যেভাবে হযরত আবুবকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা) রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) যে শাসন পদ্ধতি বা শাসনতন্ত্র রচনা করেছিলেন, হযরত ওসমান পথ প্রদর্শক হিসেবে ব্যবহার করেন। মিসর, শাম, ইরান প্রভৃতি এলাকা হযরত ওমর (রা)-এর আমলেই বিজিত হয়েছিল। হযরত ওসমান (রা) অপরাপর দেশ জয় করার সংকল্প নিলেন। এতদ্ব্যতীত বিজিত এলাকায় শান্তি রক্ষার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা

হয়। কারণ হযরত ওমর (রা)-এর ইন্তেকালের পর বিজিত এলাকাসমূহের অনেকগুলোই বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

অতএব, পরিকল্পনানুযায়ী হযরত ওলীদ ইবনে আকাবা (রা) আযারবাইজানের বিদ্রোহ দমন করেন। হামাদান অধিবাসীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) উহা নিস্তব্ধ করে দেন। হযরত আবু মূসা আশ্আরী (রা) এবং হযরত বারা ইবনে আযেব (রঃ)-এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রায় অধিবাসীদের বিদ্রোহ দমন হয়। এস্কান্দারিয়ার বিদ্রোহ দমনের জন্য হযরত আমর ইবনুল আস (রা) অগ্রসর হন এবং সহজেই উহা দমন করেন। রোমকগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে বলে সংবাদ পাওয়া মাত্রই হযরত ওসমান (রা) আট হাজার মুজাহিদ হযরত সালমান ইবনে রবীআর নেতৃত্বে হযরত আমীরে মো'আবিয়ার সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন।

খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর চতুর্দিকের বিদ্রোহ দমন করার ব্যাপারে হযরত ওসমান (রা) সেই পরিস্থিতির সম্মুখীনই হন, যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন খলিফা হযরত আবুবকর (রা) খেলাফতের প্রথম বছরেই তিনি সমুদয় বিদ্রোহ দমন করেন। এ বিদ্রোহ দমনে তিনি অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলেন এবং দিনরাত সমানে পরিশ্রম করে বিদ্রোহ দমন করেন। এ কথা নির্ঘাত সত্য যে, যদি তিনি এ বিদ্রোহ দমনে একটুও অবহেলা করতেন, তাহলে হযরত ওমর (রা)-র আমলে যেসমস্ত রাজ্য মুসলমানদের অধীনে এসেছিল, এক একটা করে সেসবই চলে যেত। কিন্তু হযরত ওসমান (রা) বিদ্রোহ দমনে মোটেই ত্রুটি করেননি। এতদ্ব্যতীত তাঁর বিজয়াভিযানও অব্যাহত ছিল। এমন কি, সারাদেশে যখন বিদ্রোহীদের দমন করা হতেছিল, তখনো হযরত ওসমান (রা)-এর মুজাহিদ বাহিনী আফ্রিকার বহু এলাকায় যুদ্ধরত ছিল।

হিজরী পঁচিশ সনে মিসরের গভর্ণর সেনাপতি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী সার্হ (রা) হযরত ওসমন (রা)-এর নির্দেশে তারাবলের (ত্রিপোলী) বিজয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু কোন বিশেষ কারণবশতঃ এ অভিযান কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়। দেখতে দেখতে দু' বছর অতীত হয়ে গেল। কিন্তু অভিযান চালান হছে না দেখে হযরত ওসমান (রা) মদীনা হতে একদল মুজাহিদ বাহিনী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী সার্হ (রা)-এর সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন, যাতে তারাবলেস অভিযান আর বিলম্বিত না হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হযরত ওসমান (রা) এ অভিযানে শুধু যোদ্ধা সৈনিকই প্রেরণ করেননি বরং প্রসিদ্ধ সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবদুর ইবনুর রহমান ইবনে আবুবকর (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রা), হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-ও প্রেরিত হইয়াছিল। এই ফৌজ পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী সারহ্ (রা) ইসলামি ফৌজ তারাবলেসের দিকে রওয়ানা করেন।

মুসলিম বীর-সেনানীগণ তারাবলেসে পৌঁছে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তথাকার অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। মুসলমানদের সাথে মোকাবেলা করার শক্তি তাদের মধ্যে ছিল না। তারা পলায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এমন সময় আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী সারহের নির্দেশক্রমে মুসলমানগণ কয়েকদলে বিভক্ত হয়ে সমগ্র তারাবলেসের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লেন। সেখানকার অধিবাসীদের জন্য এ পরিস্থিতি খুবই সংকটময় ছিল। তাই তারা নিরুপায় হয়ে অস্ত্র সংবরণ করল এবং প্রতিবছর পঁচিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা কর আদায় করার প্রতিজ্ঞা করে সন্ধি করে নিল। কিন্তু চৌত্রিশ হিজরীতে তারা কর আদায় না করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবী সারহ অতি দ্রুত সৈন্য প্রেরণ করে উহা দমন করেন এবং পুনরায় তথায় শান্তি স্থাপিত হয়।

হযরত ওসমান (রা)-এর নির্দেশানুসারে হিজরী ২৬ সনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) আলজেরিয়া এবং মরক্কোর দিকে অগ্রসর হন। অল্প সময়ের মধ্যেই এ সমস্ত এলাকার অধিবাসীগণ মুসলমানদের মোকাবিলায় অস্ত্র সংবরণ করে। তারপরই এ এলাকাসমূহে ইসলামি পতাকা উত্তোলন করা হয়। অতঃপর হযরত ওসমান (রা) ইসলামি ফৌজকে স্পেনের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দান করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে নাফে' ইবনে হোসাইন এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে নাফে' ইবনে আবদে কাইসকে এ অভিযানের জন্য সেনাপতি নিযুক্ত করেন। উভয়েই বিজয়াভিযান অব্যাহত রেখেছিলেন এবং বহু এলাকা দখল করেছিলেন, এমন সময় কোন কারণ বশত হযরত ওসমান (রা) এ অভিযান স্থগিত রাখলেন। এরপর হযরত ইবনে আবী সারহ মিসর প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইবনে নাফে' ইবনে আবদে কাইসকে সেই বিজিত এলাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

রোম সাগরের সংলগ্ন একটি শস্য-শ্যামল দ্বীপ সাইপ্রাস ভৌগোলিক দিক দিয়ে এ দ্বীপের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। কারণ, এ দ্বীপ মুসলমানগণ নিজেদের অধিকারে না নেওয়া পর্যন্ত রোমকদের আক্রমণের আশঙ্কা থেকেই যায়। হযরত আমীর মো'আবিয়া (রা) অনেক আগেই এরূপ আশংকা করেছিলেন। তিনি উহা আক্রমণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু হযরত ওমর (রা) যেহেতু নৌযুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাই তিনি কিবরিস (বর্তমান সাইপ্রাস) আক্রমণ করার অনুমতি দান করেননি। কিন্তু হযরত ওসমান (রা) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার সাথে সাথেই হযরত আমীর মো'আবিয়া (রা) তাঁর সেই পুরাতন আকাঙ্ক্ষা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে পত্রালাপ আরম্ভ করেন। হযরত ওসমান (রা)-ও নৌযুদ্ধ পছন্দ করতেন না। কিন্তু আমীর

মো'আবিয়া বহু যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝিয়ে তাঁকে সম্মত করেন। অবশ্য হযরত ওসমান (রা) একটি শর্ত আরোপ করেন যে, আমি আপনার কথায় আমি রাজি হয়েছি বটে, তবে কাউকে এ অভিযানে বাধ্য করা যাবে না।

হযরত আমীর মো'আবিয়া (রা) অনুমতি পাওয়া মাত্রই সাইপ্রাস (কিবরিস) আক্রমণের জন্য নৌবাহিনী গঠন করেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে কাইস হারেসী নৌবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হলেন এবং তিনি ইসলামি ফৌজ নিয়ে সাইপ্রাস পৌঁছেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার অল্পক্ষণ পরেই আবদুল্লাহ্ ইবনে কাইস শহীদ হন। কিন্তু আওফ ইবনে আযদী তৎক্ষণাৎ ইসলামি পতাকা হাতে তুলে নেন এবং বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে সাইপ্রাসের অধিবাসীগণকে পর্যুদস্ত করে তোলেন। ফলে তারা সন্ধি করতে বাধ্য হয়।

হযরত ওসমান আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি কিছুটা দুর্বলতা প্রদর্শন করলেও তিনি তাঁর কোন অনুপযুক্ত আত্মীয়কে গুরত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেননি। যদি তিনি পক্ষপাতিত্বের দোষে দোষী থাকতেন তাহলে তিনি– ১. জনগণের দাবি এবং অভিযোগ উপেক্ষা করতেন এবং কখনো আত্মীয়-স্বজনকে ঐ সমস্ত গুরত্বপূর্ণ পদ হতে বরখাস্ত করতেন না। ২. তিনি তাঁর কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁর খিলাফতের প্রথম ৬ বছরের মধ্যে যখন তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ৩. কেবল কুফা, বসরা এবং মিসর ছাড়া অন্যান্য প্রদেশের জনগণ খলিফার বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ আনেননি।

খলিফা ওসমানের নিযুক্ত সকল গভর্নর তাঁর আত্মীয় ছিলেন না এবং তাঁর নিযুক্ত কোন গভর্নরই অনুপযুক্ত ছিলেন না। বিশেষ অবস্থায় ও প্রয়োজনে তাঁকে ওয়ালিদ-বিন-ওকবা, আব্দুল্লাহ-বিন-আমির এবং ওয়ালিদ-বিন-সা'দকে যথাক্রমে কুফা, বসরা এবং মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করতে হয়েছিল। কিন্তু জনগণ তাঁদের অপসারণ দাবি করলে তিনি তাঁদিগকে শুধু অপসারিতই করেননি, মদপানের অভিযোগে তাঁদের একজনকে তিনি বেত্রদণ্ডও প্রদান করেন। তদুপরি, তিনি তাঁর খিলাফতের প্রথম ও শেষ উভয় অর্ধেই আত্মীয়-জ্ঞাতিদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযক্ত করেছিলেন। কিন্তু প্রথমার্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত না হয়ে শেষার্ধে কেন তাঁর বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উত্থাপিত হল তা সহজে বোধগম্য নয়। এ অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না।

হযরত ওসমান ১২ বছর খিলাফতে অধিষ্ঠিত থেকে ৮২ বছর (কারো মতে ৮৬ বছর) বয়সে (১৭ই জুন, ৬৫৬ খ্রি.) ইন্তেকাল করেন। তিনি মধ্যামাকৃতির, শ্মশ্রুযুক্ত এবং দীর্ঘ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁর দানশীলতা, আর্থিক

প্রতিপত্তি, অমায়িকতা ও ধর্মভীরুতার জন্য ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন।

ইসলামের সেবায় হযরত ওসমান (রা) তাঁর সর্বস্ব উৎসর্গ করেন। তিনি বহু টাকা ব্যয়ে মদীনায় মুসলমানদের জন্য কূপ খনন করেন এবং মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য জমি ক্রয় করেন। তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যও তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে প্রায় দু হাজার ক্রীতদাসকে দাসত্ব হতে মুক্তি দিয়েছেন। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েও তিনি দীন দরিদ্রের ন্যায় জীবন-যাপন করতেন। নিজ পরিবারের খরচ বহনের জন্য বাইতুলমাল হতে তিনি এক কপর্দকও গ্রহণ করতেন না।

তিনি স্ববংশীয় উমাইয়াগণকে যথেষ্ট সুযোগ দান করেছেন বলে অনেক ঐতিহাসিক অভিযোগ করেন, কিন্তু তাঁর সময়ের দেওয়ানখানার রেজিস্টার অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এ অপবাদ সম্পূর্ণ অমূলক। উমাইয়াগণের সরকারি বৃত্তি তাঁর সময়ে হাশেমীদের তুলনায় বেশি ছিল না। নৌ-বাহিনীর ব্যয়ভার বহনের জন্য সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়াকে তিনি সেখানকার সরকারি সম্পত্তি ভোগদখলের অধিকার প্রদান করেন। ইচ্ছা করলেই তিনি বিদ্রোহীদের আক্রমণ হতে নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন এবং তাদিগকে ধূলিসাৎও করতে পারতেন। কিন্তু ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতীক ওসমান (রা) আত্মরক্ষার জন্য কোন মুসলমানের এক ফোঁটা রক্তপাত করতে রাজি ছিলেন না। দুর্জয় বাইজানটাইন শক্তিকে যদি তিনি পরাভূত করতে সমর্থ হয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই সকল বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদ করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। কিন্তু মহান খলিফা অন্যের রক্তপাত অপেক্ষা বৃহত্তর ঐক্য ও মানবতার খাতিরে নিজেকে কুরবান করে জগতের বুকে এক মহান ত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

সততা ও ধর্মপরায়ণতা তাঁর প্রধান গুণ ছিল। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি নামাজের ইমামতি করেন। তিনি আল্লাহ্‌র আরাধনায় অবসর সময় নিমগ্ন থাকতেন। পবিত্র কুরআন পাঠে তিনি বেশি সময় ব্যয় করতেন। বিনয় ছিল হযরত ওসমানের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সরল ও দয়ালু। এজন্য তিনি অপরাধীকেও অপরিমিত প্রীতি ও অনুকম্পা প্রদর্শন করতেন। এ সুযোগে ধূর্ত ও বিশ্বাসঘাতক মারওয়ান তাঁর খিলাফতের সর্বনাশ সাধন করে। মারওয়ানের চক্রান্তেই তিনি জনসাধারণের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠেন এবং পরিশেষে শাহাদৎ বরণ করেন। কিন্তু আসলে তাঁর ন্যায় জনদরদী, দীন-দুঃখীর বন্ধু ও নিরহংকার শাসক পৃথিবীতে বিরল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে এত ভালবাসতেন যে, তাঁর সাথে পর পর দু' কন্যার বিয়ে দেন। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক মহান খলিফা।

হযরত ওসমান বিজেতা হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে সিরিয়ার এবং মিসরের শাসনকর্তাগণ শুধু বাইজানটাইনদের আক্রমণই প্রতিহত করেননি, পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান, নিশাপুর, মার্ভ, সাইপ্রাস, রোড্স এবং আরো অনেক অঞ্চলে মুসলিম শাসনও প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম সাম্রাজ্য উত্তরে কৃষ্ণসাগর ও পূর্বে গজনী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। তাঁর খিলাফতে সর্বপ্রথম মুসলিম নৌ-বাহিনী গঠিত হয়।

শাসন পদ্ধতির ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সুযোগ্য খলিফাদের নীতি অনুসরণ করেন। মজলিসে শূরার মাধ্যমে তাঁর খিলাফতেও সমস্ত ব্যাপারে ফয়সালা করা হত। রাজস্ব বিভাগ, কৃষি বিভাগ ইত্যাদিরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। মদীনার বন্যা-প্রতিরোধের জন্য এক বিরাট বাঁধ নির্মাণ করা হয়। তাঁর আমলে অনেক রাস্তা, সেতু মসজিদ, বাসগৃহ ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। তিনি কা'বা ঘরের সম্প্রসারণ করেন এবং মদীনার মসজিদেরও সংস্কার সাধন করেন। খলিফা অনাথ, আতুর, বিধবা, গরীব ও অসহায়দের প্রতি বিশেষ নজর দিতেন। এক কথায়, জনসাধারণের সুখ ও সমৃদ্ধ সাধনই ছিল তাঁর শাসনের মূলনীতি।

তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে, তাঁরই প্রচেষ্টায় কুরআনের ধারাবাহিক সংকলন প্রথম প্রকাশিত হয় এবং আজ পর্যন্তও উহা সেইভাবেই বিরাজমান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ওসমানের (রা) অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

হযরত ওসমান গনী (রা)-এর মাযহাবী এবং রাজনৈতিক কার্যাবলী যদিও হযরত আবুবকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা)-এর ন্যায় উজ্জ্বল নহে; তবুও তিনি যে প্রেরণা নিয়ে ইসলামের প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করেছেন, ইতিহাসে এর নযীর পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর আমলে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পরিবর্তন, মারওয়ানের ইসলামবিদ্বেষী চাল, বনু উমাইয়ার গদিলোভী ব্যক্তিবর্গের কার্যাবলী এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবার ইসলামবিরোধী আন্দোলনে পরিস্থিতি এতই ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল যে, হযরত ওসমান (রা) তো অত্যন্ত নম্র মেজাজের লোক ছিলেন– যদি তাঁর পরিবর্তে কোন কঠোর মেজাজের খলিফাও হতেন, তাহলে তিনিও সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন।

মাযহাবী খেদমতের মধ্যে কোরআনী খেদমত হল হযরত ওসমান (রা)-এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং চিরস্থায়ী ও অনন্য সাধারণ খেদমত। কোরআন শরীফের সেই কপি, যা হযরত আবুবকর (রা), হযরত ওমর (রা) এবং হযরত আলী (রা)-এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জমা করা হয়েছিল, উহা উম্মুল মোমেনীন হযরত হাফসা (রা)-এর কাছে রক্ষিত ছিল। তিনি হযরত হাফসার নিকট হতে তা নিয়ে হযরত যাইদ ইবনে সাবেত (রা) এবং অপরাপর লেখক সাহাবীদের সাহায্যে উহা কয়েক কপি নকল করিয়ে বিভিন্ন এলাকায় এক এক কপি করে

প্রেরণ করেন। তৎসঙ্গে তিনি এই নির্দেশও জারি করলেন যে, যারা কোরআনের কোন অংশ মুখস্থ করে লিখিতভাবে নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছে, তারা যেন অবিলম্বে সেসব অংশ খলিফার দরবারে প্রেরণ করে। এ নির্দেশ পাওয়ার পর যার কাছেই কোরআনের যে কোন অংশ লিখিত আকারে ছিল, তাদের প্রত্যেকেই তা পাঠিয়ে দিল। পরে আসল কপির সাথে মিলিয়ে দেখা গেল যে, এতে অনেক ভুল রয়েছে। পরবর্তীকালে এ সকল ভুলের কারণে ফাসাদ সৃষ্টি হতে পারে, এ আশঙ্কা করে তিনি সেসব খণ্ডাংশ পুড়িয়ে ফেলেন।

খেলাফতের শৃঙ্খলা বহাল রাখার বেলায় হযরত ওসমান (রা) কারো পরামর্শ আগ্রাহ্য করেননি; বরং তিনি যেকোন সৎ পরামর্শকে ধন্যবাদের সাথে স্বাগত জানাতেন। হযরত তালহা (রা) পরামর্শ দান করলেন যে, দেশের পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য কিছু লোক নিযুক্ত করা হোক। হযরত ওসমান (রা) এ পরামর্শ পছন্দ করলেন এবং বেশ কিছুসংখ্যক লোক বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করলেন, যাতে দূর দেশের ভালমন্দ সংবাদ দরবারে খেলাফত পর্যন্ত সহজে পৌঁছতে পারে।

বাইতুল মালের উন্নতির দিকে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। এমন কি, শুধু মিসরের বার্ষিক আয়ই বিশ লক্ষ হতে চল্লিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছিল। বাইতুল মালের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি জনগণের অযীফা (সরকারী বৃত্তি)-ও বৃদ্ধি করে দিতেন এবং রমযান মাসে প্রত্যেককে বিশেষ অযীফা দেয়া হত। বহু লোক এমনও ছিল, যারা দু'বেলা খাবার বাইতুল মাল হতে পেত। খাইবারের দিক হতে বন্যার ভয় সর্বদা মদীনাবাসীকে আতঙ্কিত করে দূরীভূত করে দেন। জনহিতকর কার্যাবলীর মধ্যে হযরত ওসমান (রা)-এর এই নহর খননের কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হযরত ওমর (রা) ঘোড়া, উট এবং অপরাপর সরকারি গৃহপালিত পশু চরানোর জন্য যেসমস্ত খামারের বন্দোবস্ত করেছিলেন, হযরত ওসমান (রা) ঐ সমস্ত খামার আরো উন্নতমানের করে গড়ে তোলেন। খামারের আশেপাশে কূপ খনন করে পানির সুবন্দোবস্ত করেন। বনু হাবীবার অধিকারে একটি বিরাট কুফ ছিল। হযরত ওসমান (রা) উহা ক্রয় করে খামারের জন্য দান করেন। এরপরও পানির অভাব ছিল। তিনি আর একটি কুপ খনন করে পানির অভাব চিরতরে মিটিয়ে দেন। পানির বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে খামারের এবং পশুদের রাখাল ও প্রহরীদের থাকার জন্য খামারের নিকট কলোনী তৈরি করে দেন। সৈনিকদের অভাব-অভিযোগের দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল অধিক। তিনি সৈনিকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে অন্যান্য কাজ হতে পৃথক করে দেন, যাতে জরুরি অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছতে তাদের কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়।

বহু দাস-দাসী এবং খাদেম থাকা সত্ত্বেও হযরত ওসমান গনী (রা) অধিকাংশ সময় নিজের কাজ নিজেই সমাধা করতেন। শায়িত কোন গোলামকে কাজের জন্য কখনো তিনি জাগাতেন না। ইসলাম গ্রহণের পর প্রতি শুক্রবার তিনি একজন করে গোলাম আযাদ করতেন। একদা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোন একজন গোলামের কান ধরে টান দিয়েছিলেন। পরে অনুতপ্ত হয়ে সেই গোলামকে ডেকে প্রতিশোধ নেয়ার আদেশ দিলেন। গোলাম প্রতিশোধ নিতে সম্মত হল না; কিন্তু তিনি গোলামকে প্রতিশোধ নিতে বাধ্য করলেন। বলে উঠলেন, 'জোরে টান, যেমন আমি টেনেছিলাম। পার্থিব প্রতিশোধ পরকালের আযাবের চাইতে সস্তা।'

হযরত ওসমান গনী (রা)-এর প্রথম বিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা হযরত রোকাইয়া (রা)-এর সাথে হয়েছিল। তিনি বদর যুদ্ধের সময় মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর গর্ভে আবদুল্লাহ্ নামক একজন ছেলের জন্ম হয়, কিন্তু শৈশবেই তিন মারা যান। দ্বিতীয় বিয়েও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা হযরত উম্মে কুলসুমের সাথে হয়। হিজরী নবম সনে তিনিও ইন্তেকাল করেন। তাঁর গর্ভে কোন সন্তান ছিল না। ফাখতা বিনতে গাযওয়ান তাঁর তৃতীয়া স্ত্রী ছিলেন এবং তাঁর গর্ভেও কোন সন্তান ছিল না। উম্মে ওমর তাঁর চতুর্থা স্ত্রী ছিলেন এবং গর্ভে ওমর, খালেদ, আবান ও মরিয়ম– এ চারজন সন্তানের জন্ম হয়। ফাতেমা বিনতে ওলীদ ছিলেন তাঁর পঞ্চমা স্ত্রী। তাঁর গর্ভে ওলীদ এবং সাঈদ জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত উম্মুল বানীন বিনতে ওআইনা, রমলা বিনতে শাইবা এবং নায়েলা বিনতে ফরাফেসাও তাঁর বিয়ে বন্ধনে এসেছিলেন। হযরত নায়েলা ওসমান গনী (রা)-এর শাহাদতের সময় জীবিত ছিলেন এবং স্বামীকে রক্ষা করতে গিয়ে আক্রমণ প্রতিরোধ করার সময় তাঁর একটি আঙুল কাটা পড়েছিল। তাঁর সন্তানদের মধ্যে শুধুমাত্র হযরত আবানই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

হযরত ওসমান (রা) সবদিক দিয়েই অনন্যা সুন্দর ও সুদর্শন। সুন্দর চেহারায় দাগ ছিল বলে চেহারা আরো উজ্জ্বল দেখাত। তিনি সারাজীবন লুঙ্গি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যেদিন তিনি শাহাদতবরণ করবেন, সেদিনই পাজামা পরিধান করেছিলেন। বোখারী শরীফের রেওয়াজ মোতাবেক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেই আংটি, যাতে 'মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' লেখা ছিল, হযরত আবুবকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা)-এরপর তাঁর হাতে এসেছিল। যতদিন পর্যন্ত উহা তাঁর কাছে ছিল, খেলাফতের কোন কাজে অসুবিধা দেখা দেয়নি। কিন্তু যখন আরীছের কুয়ায় আংটি পড়ে গেল এবং বহু তালাশের পরেও উহা উদ্ধার করা গেল না, তখন হতেই পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করতে লাগল। এমন কি, শেষ পর্যন্ত তিনি দুষ্কৃতকারীদের হাতে শাহাদত বরণ করলেন।

হযরত আলী (রা)

একদিন রাসূল (সা) এক বালককে একটি দাওয়াতের আয়োজন করার জন্য নির্দেশ দান করেন। হুকুম পেয়েই বালক দাওয়াতের আয়োজন করল। আত্মীয়-স্বজনদিগকে দাওয়াত করা হল। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে হযরত হামযা, হযরত আব্বাস, আবু তালেব, আবু লাহাব ছিলেন। রাসূল (সা) এবং বালক সকলকে ভদ্রতার সাথে খাওয়ালেন। অতঃপর রাসূল (সা) বললেন, 'হে আবদুল মোত্তালেবের সন্তানগণ। আমি তোমাদের জন্য সে বস্তু নিয়ে এসেছি, যা তোমাদিগকে ইহকালের উত্তম নেয়ামতসমূহ দ্বারা ভূষিত করবে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে আমাকে এ কাজে সাহায্য করবে?'

সকলেই নীরব। কারো মুখে কোন কথা নেই। হযরত আলী দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি আপনাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম বয়সী এবং রুগ্ন। তবুও আমি আপনার সহায়ক হব।'

রাসূল (সা) বললেন, 'তুমি বস।'

অতঃপর দ্বিতীয় তৃতীয়বার একইভাবে জিজ্ঞেস করলেন। প্রত্যেকবারই সকলে নীরব রইল। কিন্তু বালকটি প্রত্যেকবারেই দাঁড়িয়ে রাসূল (সা)-এর সহচার্যে এবং সহায়ক হিসেবে নিজেকে পেশ করলেন। তৃতীয়বারে নিজেকে এমনভাবে পেশ করলেন, যার জন্য রাসূল (সা) বললেন, "তুমিই আমার ভ্রাতা এবং ওয়ারিশ হবে।" এ অসাধারণ সাহসী বালকটির নাম হযরত আলী ।

মুহাম্মদ (সা) যখন নবুয়ত প্রাপ্ত হন, তখন হযরত আলীর বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর। তিনি রাসূল (সা)-এর আহ্বানে সাড়া দেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। বিবি খাদিজার পরেই তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম মুসলমান।

হযরত আলী ৬০০ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের হাশেমী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হযরতের চাচা এবং প্রতিপালক আবু তালিবের পুত্র। তাঁর মাতার নাম ছিল ফাতিমা। তাঁর ডাক নাম ছিল আবু হাসান এবং আবু তোরাব। মহানবী এবং হযরত আলী উভয়েই হাশেমী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। এ গোত্রের উপর কাবাগৃহের তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত ছিল। আবু তালিবের

আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না হওয়ায় হযরত মুহম্মদ (সা) আলীর লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। রাসূল (সা) তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তিনি রাসূল (সা) সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন বলে তাঁকে পুরাপুরি জানার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা) এবং ওসমানের (রা) মত বিত্তশালী ছিলেন না বলে আলী ইসলামের কল্যাণে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য করতে পারেননি। কিন্তু তিনি তাঁর অসি ও মসি দ্বারা ইসলামের খেদমতে আত্মোৎসর্গ করে গিয়েছেন। রাসূল (সা) সাথে তিনিও কুরাইশদের হাতে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেন। হিজরতের সময় শত্রু পরিবেষ্টিত গৃহে রাসূল (সা) নির্দেশে মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তিনি রাসূল (সা)-এর বিছানায় শায়িত ছিলেন। আর রাসূল (সা) রাতের অন্ধকারে আত্মগোপন করে হিজরত করেন। প্রাতঃকালে আলীকে নবীর শয্যায় শায়িত দেখে কুরাইশগণ হতাশ ও বিস্মিত হয়ে যায়।

রাসূল (সা)-এর উপর যত রকম বিপদ এসেছে, প্রত্যেকটিতে হযরত আলী (রা) সঙ্গে ছিলেন। মক্কাবাসীরা রাসূল (সা)-কে বয়কট করল এবং বাক্যালাপ, বেচাকেনা সবকিছু বন্ধ করে দিল। সমস্ত মুসলমান শে'বে তালেব নামক উপত্যাকায় অন্তরীণ হয়ে গেল। এত বিপদ সত্ত্বেও হযরত আলী (রা) রাসূল (সা)-এর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। হযরত আলীও এ বয়কটের সময় রাসূল (সা)-এর সঙ্গে বন্দী ছিলেন।

হযরত আলী (রা) একজন সুসাহিত্যিক এবং অসাধারণ বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি নবীকরিম (সা)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত প্রায় প্রত্যেকটি যুদ্ধেই অশগ্রহণ করে অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন এবং অধিকাংশ যুদ্ধেই তিনি রাসূল (সা)-এর পতাকাধারী ছিলেন। বদরের যুদ্ধে দ্বৈত সংঘর্ষে তিনি কুরাইশ বীর আমর-ইবনে-আবুজুদকে পরাজিত ও নিহত করে খ্যাতি অর্জন করেন। ওহুদ, খন্দক, মক্কা বিজয়ের সময় এবং বিশেষ করে খায়াবার যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করে বিখ্যাত কামুস দুর্গ জয় করে হযরত আলী (রা) অসাধারণ শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করেন। মহানবী তাঁর বীরত্বের জন্য তাঁকে 'আসাদুল্লাহ্' (আল্লাহ্র সিংহ) উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধির লেখক ছিলেন। হুনায়ুনের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু তাবুক অভিযানে হযরত তাঁকে মদীনায় থাকতে নির্দেশ দিলে তিনি অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য রাসূল (সা)-কে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। এতে রাসূল (সা) বলেন, "You stand to me in the relation in which Haron stood to Moses except that there is to be no prophet after me." অর্থাৎ "হারুনের সাথে মুসার যেমন সম্পর্ক ঠিক তোমার সাথে আমার সেই সম্পর্ক– শুধু পার্থক্য এই যে, আমার পর কোন নবী নেই।"

সূরা তওবা নাযিল হলে রাসূল (সা) দুশমনদের কাছে এ সংবাদ জ্ঞাপন করার ভার আলী (রা)-র উপর ন্যস্ত করেছিলেন। রাসূল (সা) নির্দেশে হিজরীর দশম সালে তিনি ইয়েমেনে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে যান এবং সেখানে তিনি প্রভূত সফলতা অর্জন করেন। সেখানে পরে তিনি প্রধান কাজী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা) এবং ওসমান (রা)-এর শাসনকালে তিনি উপদেষ্টা পদে অধিষ্ঠিত থেকে খলিফাগণকে উপদেশ প্রদান করতে সদা প্রস্তুত ছিলেন। ওমর (রা)-এর শাসন বিধির অধিকাংশই তাঁর পরামর্শ অনুসারে প্রবর্তিত হয়েছিল। স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করেন। নিজ কন্যা উম্মে কুলছুমের সাথে তিনি ওমর (রা)-এর বিয়ে দেন। ওসমান (রা)-এর গৃহ শত্রুবেষ্টিত হলে পুত্র হাসান ও হোসেনকে তাঁর গৃহদ্বার পাহারায় নিযুক্ত করেছিলেন। এরূপে খলিফা হবার পূর্বে হযরত আলী (রা) নানাভাবে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন।

৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জুন খলিফা ওসমানের হত্যাকাণ্ডের পর খিলাফতের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং খিলাফতের পবিত্রতা ও মর্যাদা নষ্ট হয়ে যায়। বিশৃঙ্খলা এবং সন্ত্রাসের রাজত্বে কোন যোগ্য ব্যক্তিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে খিলাফতের গুরুদায়িত্ব বহনে সম্মতি প্রকাশ করলেন না। অবশেষে ওসমান হত্যার পঞ্চম দিবসে শক্তিশালী মিসরীয় বিদ্রোহী দলের নেতা ইবনে সাবা রাসূল (সা)-এর ন্যায্য উত্তরাধিকারী হিসাবে আলী (রা)-র নাম প্রস্তাব করেন। বসরা ও কুফার বিদ্রোহীগণও এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। অবশেষে আলী (রা) মদীনার বিশিষ্ট নাগরিকদের অনুরোধে এবং ইসলামের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে খিলাফতের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন (২৩শে জুন ৬৫৬ খ্রি.)। জনগণ একে একে সকলেই তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

খলিফা হয়ে হযরত আলী বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। রাজ্যে তখনো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তার উপর রাজ্যের সকল স্থান হতে ওসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি উত্থাপন করা হল। খলিফা প্রথমে সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে পরে হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "আমিও এ বিষয়ে কম আগ্রহান্বিত নই, কিন্তু এত সত্বর আমি উহা করতে পারি না। খুব সংকটজনক মুহূর্ত এখন যদি শান্তিভঙ্গ করা হয়, তবে বেদুঈনগণ এবং বিদেশীগণ বিদ্রোহী হয়ে বসবে এবং আরবদেশ পুনরায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। ....যতদিন সংকটজনক অবস্থা হতে আল্লাহ আমাকে কোন উপায় না দেখান ততদিন আপনারা অপেক্ষা করুন। এতে অনেকেই, বিশেষ করে তালহা (রা), যুবাইর (রা), হযরত আয়েশা (রা) এবং

মুয়াবিয়া (রা) অসন্তুষ্ট হয়ে খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। তার উপর খলিফা হওয়ার অব্যবহিত পরেই হযরত আলী ওসমান (রা) কর্তৃক নিযুক্ত দুর্নীতিপরায়ণ শাসনকর্তাগণকে বরখাস্তের আদেশ প্রদান করেন এবং উমাইয়াগণ কর্তৃক অন্যায়ভাবে দখলকৃত জায়গীর ও ভূসম্পত্তি রাজসরকারে প্রত্যর্পণের নির্দেশ দেন এবং ওমর (রা)-এর বিধানানুযায়ী রাজস্ব বণ্টনের জন্যও তিনি আদেশ প্রদান করেন। ফলে সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া ব্যক্তিগতভাবে এবং উমাইয়াগণ সাধারণভাবে খলিফার বিরুদ্ধে প্রবল শত্রুতা আরম্ভ করল। বস্তুতঃ হযরতর আলী (রা)-র সাড়ে চার বছরের রাজত্বকাল অন্তর্বিপ্লব ও গৃহবিবাদে পরিপূর্ণ ছিল।

হযরত ওসমান (রা)-র হত্যাকে কেন্দ্র করে হযরত আলী (রা)-র খিলাফতে যে দলীয় বিদ্বেষ ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, তার ফলে— ক. উষ্ট্রের যুদ্ধ, খ. সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ এবং গ. নাহ্‌রাওয়ানের যুদ্ধ নামে তিনটি গৃহযুদ্ধ হয়ে ইসলামের সংহতি ও ঐক্যের গৌরবময় ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে।

খলিফা হওয়ার অব্যবহিত পরই হযরত তাল্‌হা (রা) ও হযরত যুবায়ের (রা), হযরত আলী (রা)-র নিকট ওসমান (রা)-র হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি করেন। খলিফা নিজেও তৎক্ষণাৎ দুষ্কৃতিকারীগণকে উপযুক্ত শাস্তি বিধান করতে পারলে আশ্বস্তবোধ করতেন। কিন্তু হযরত ওসমানের হত্যা কতিপয় ব্যক্তি বিশেষের কাজ ছিল না। এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের পিছনে কুফা, বসরা ও মিসরের বহুসংখ্যক লোক জড়িত ছিল। কাজেই এ গোলযোগপূর্ণ মুহূর্তে বিদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে হাত উত্তোলন করলে খিলাফতের ভাঙন শুরু হবে ভেবে তিনি দুষ্কৃতিকারীগণের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। ইহাতে হযরত তাল্‌হা (রা) ও হযরত যুবায়ের (রা) নীতিগতভাবে হযরত আলী (রা)-র বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেন।

এরূপে ওসমানের হত্যাকারীদিগকে শাস্তি বিধানের একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে হযরত তাল্‌হা (রা), হযরত যুবায়ের (রা) খলিফার প্রতি তাঁদের আনুগত্যের শপথ বিস্তৃত হয়ে মদীনা ত্যাগ করেন। মক্কার পথে যাওয়ার কালে হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রা) সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা তাঁকেও দলে ভিড়াতে সক্ষম হলেন। তাঁরা মদীনা, মক্কা ও ইরাক হতে তিন সহস্রাধিক সৈন্য সংগ্রহ করে ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বসরা দখল করেন। আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-র অমিয়মাখা অভিভাষণে মুগ্ধ হয়ে বসরাবাসিগণ তাঁর সঙ্গে যোগদান করেন। বসরার শাসনকর্তা ওসমান-বিন-হানিফ পরাজিত এবং ধৃত হন। তাঁরা ওসমানের হত্যায় জড়িত কিছুসংখ্যক দুষ্কৃতিকারীকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে হযরত আলী মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে সিরিয়ায় অগ্রসর না হয়ে ২০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনীসহ কুফার পথে বসরার দিকে রওয়ানা হলেন। কুফার শাসনকর্তা আবু মুসা আল-আশারী তাঁদের বিরুদ্ধে খলিফাকে সাহায্য করতে রাজি না হওয়ায় পদচ্যুত হন। এ ঘটনার পর ৯,০০০ কুফাবাসী হযরত আলী (রা)-র সৈন্য বাহিনীর সাথে যোগদান করেন। হযরত আলী (রা) বসরায় উপস্থিত হয়ে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব করেন। হযরত তাল্‌হা (রা), হযরত যুবায়ের (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) এ প্রস্তাবে সম্মত হন। আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, খিলাফতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই তদন্ত করে অপরাধিগণকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে। দুষ্কৃতিকারিগণ এ প্রস্তাব অবগত হয়ে শংকিত হয়ে উঠল এবং তা বানচাল করে দিতে বদ্ধপরিকর হল। অবশেষে ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে দৃষ্কৃতিকারীগণ খলিফার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে নগরের উপকণ্ঠে কোরায়বা নামক স্থানে রাতের অন্ধকারে হযরত আয়েশা (রা)-র নিদ্রিত বাহিনীর উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে বহু মুসলিম হতাহত হতে লাগল। এ সংবাদ শ্রবণ খলিফা এবং বিবি আয়েশা উভয়ে বিস্মিত হলেন। প্রত্যুষে হযরত আয়েশা (রা) উষ্ট্রে এবং খলিফা হযরত আলী (রা) অশ্বে আরোহণ করে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করেন। ইতোমধ্যে হযরত তাল্‌হা (রা) ও হযরত যুবায়ের (রা) সন্ধির পর মক্কার পথে বসরা ত্যাগ করলে পথিমধ্যে দু'জন সাহাবী কর্তৃক নিহত হন। আয়েশা (রা) যুদ্ধ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তাঁর জনৈক সৈনিককে কুরআন উত্তোলন করতে আদেশ করেন, কিন্তু তারা কুরআনধারীকে নিহত করে স্বয়ং উম্মুল মুমেনীন বিবি আয়েশাকে আক্রমণ করে বসে। এমতাবস্থায় খলিফা আলী বহুকষ্টে যুদ্ধ বন্ধ করতে সক্ষম হন। খলিফা আয়েশা সিদ্দীকাকে (রা) তাঁর ভ্রাতা মুহম্মদ বিন-আবু বকরের পাহারাধীনে ৪০ জন মহিলাসহ স্বসম্মানে ও নিরাপদে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে হযরত আলী হতাহতের দাফন ও সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন।

ফলাফলের দিয়ে উষ্ট্রের যুদ্ধ কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা না হলেও সম্মুখ যুদ্ধে দুটি মুসলিম সেনাদলের শক্তি পরীক্ষার নজীর এ যুদ্ধেই দেখা গেল। উভয়পক্ষের প্রায় সাড়ে চার হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল। মক্কা, মদীনা, কুফা ও বসরায় হযরত আলী (রা)-র কতৃত্ব স্থাপিত হল বটে, কিন্তু তাঁর এ বিজয় প্রকৃতপক্ষে হযরত ওসমান (রা) হত্যাকারীদেরই বিজয়। অবশ্য এ যুদ্ধে কিছুটা কুফলও পরিলক্ষিত হয়। এ যুদ্ধের ফলে মক্কা, বসরা ও কুফার মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধের অবসান ঘটে।

অতঃপর হযরত আলী আব্দুল্লাহ-বিন-আব্বাসকে বসরার, সাহল-ইবন হানীফকে হিজাজের এবং কায়েস-বিন সা'দকে মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এরপর খলিফা ইরাকীদের সমর্থনের প্রতিশ্রুতিতে এবং সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে কুফার অবস্থানের জন্য ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মদীনা হতে কুফার রাজধানী স্থানান্তর করেন। খিলাফতের পূর্বাঞ্চলে সুশাসনের জন্য এবং বিশেষ করে বেদুইনগণকে পদানত রেখে সাম্রাজ্যের শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তিনি রাজধানী পরিবর্তন করতে বাধ্য হন।

উচ্চাভিলাষী মুয়াবিয়া ওসমান হত্যাকে তাঁর স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারে তৎপর হয়ে উঠেন। দুষ্কৃতিকারিগণকে আপাততঃ খলিফা শাস্তি প্রদানে অক্ষম জেনে তিনি ওসমানের রক্তাক্ত বস্ত্রাদি এবং তদীয় মহিষী নায়েলার কর্তিত অঙ্গুলি প্রকাশ্যে প্রদর্শন করে জনসাধারণকে হযরত আলীর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তোলেন। যেহেতু আলী অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, মুয়াবিয়া আরো ঘোষণা করেন যে, খিলাফত লভের জন্য হযরত আলী ওসমান হত্যার ব্যাপারেও গোপনে জড়িত আছেন। ওসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবির মধ্যে আসলে মুয়াবিয়ার খলিফা হওয়ার প্রবল বাসনা নিহিত ছিল। ইহাই ছিল হযরত আলী এবং মুয়াবিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সংঘর্ষের একমাত্র কারণ।

মুয়াবিয়া খলিফা আলীর আদেশ পালন করা তো দূরের কথা, খলিফা ওসমানের হত্যাকারীদেরকে তৎক্ষণাৎ সমুচিত শাস্তি বিধানে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় তাঁকে খলিফা বলে স্বীকার করতেও রাজি হলেন না। মুয়াবিয়ার ধৃষ্টতা ও অবাধ্যতার ফলে ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে হযরত আলী ৫০,০০০ সৈন্যসহ সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। এ সংবাদ শুনে করে মুয়াবিয়া ৬০,০০০ সৈন্যসহ ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে সিফ্‌ফিন নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে মুসলমানদের অনর্থক রক্তপাত ঘটানো এড়াবার জন্য হযরত আলী মুয়াবিয়ার কাছে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে একজন দূতকে পাঠান এবং ইসলামের স্বার্থেই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করার জন্য মুয়াবিয়াকে আহ্বান করেন। কিন্তু মুয়াবিয়ার ঔদ্ধত্য ও জঙ্গী মনোভাবের কোনরূপ পরিবর্তন হল না।

পরিশেষে, যুদ্ধ করে বহু লোকক্ষয় এড়াবার জন্য খলিফা হযরত আলী (রা) খিলাফতের নিষ্পত্তি করার জন্য মুয়াবিয়াকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন। কিন্তু ধূর্ত মুয়াবিয়া বাঘের মোকাবিলা করতে রাজি ছিল, কিন্তু 'আল্লাহ্‌র বাঘের' (শের-ই-খোদা) সাথে লড়াই করে অনিবার্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে রাজি হলেন না। অবশেষে আপোসের সকল প্রকার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জুলাই যুদ্ধ শুরু হল। প্রথমে মুয়াবিয়ার সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করলে খলিফা

বাহিনী সেনাপতি মালিক আল-আস্‌তারের নেতৃত্বে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে মুয়াবিয়া বিজয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে হতাশ হয়ে পড়েন। অবশ্যম্ভাবী পরাজয় এড়াবার জন্য তিনি তাঁর প্রধান সেনাপতি ও উপদেষ্টা কূটনীতিবিদ আমর-ইবনুল-আসের পরামর্শে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য একটি অভিনব কৌশল গ্রহণ করেন। অগ্রবর্তী সৈন্যদলকে তাদের বর্শা ও পতাকার সঙ্গে কুরআন বেঁধে চিৎকার করে আশ্রয় প্রার্থনা করতে আদেশ দেন। হযরত আলী (রা)-র সৈন্যদলকে মধ্যে যাঁরা হাফিজ-ই-কোরান ছিলেন, তাঁরা কুরআনের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষার্থে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য খলিফাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। হযরত আলী (রা) বিদ্রোহীদের চক্রান্ত বুঝতে পেরেও সৈন্যবাহিনীর চাপে অনিচ্ছা সত্ত্বে বাধ্য হয়ে যুদ্ধবিরতিতে সায় দেন।

এরপর কলহটির আপোস-মীমাংসার জন্য উভয় পক্ষ হতে একজন করে সালিশ বা মধ্যস্থ ব্যক্তি নিযুক্ত হল। আলীর পক্ষ হতে কুফার পদচ্যুত গভর্নর সরলমনা আবু মুসা আশারী এবং মুয়াবিয়ার পক্ষ হতে ধূর্ত আমর প্রতিনিধি মনোনীত হলেন। এ ছাড়া উভয় সালিশই নিজেদের ৪০০ লোক সঙ্গে আনতে পারবেন। পবিত্র কুরআনের নির্দেশানুযায়ী তারা সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হলে উক্ত ৮০০ লোকের উপর সিদ্ধান্তের ভার অর্পিত হবে এবং তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতই মেনে নিতে হবে।

নির্দিষ্ট সময়ে মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী দুমাতুল-জন্দল (আজরুহ) নামক স্থানে সালিশী মজলিস বসল। আমর আবু মুসাকে বুঝালেন যে, ইসলামের স্বার্থে আলী ও মুয়াবিয়া উভয়কে অপসারণ করতে হবে। স্থির হল যে, প্রথমে আবু মুসা আলী (রা)-র পদচ্যুতি সর্বসমক্ষে ঘোষণা করবেন এবং পরে আমর মুয়াবিয়ার পদচ্যুতি ঘোষণা করবেন। প্রস্তাব অনুযায়ী সরলমতি আবু মুসা বেদীর উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, 'আমি আলীকে খেলাফত হতে পদচ্যুত করলাম।' এরপর আমর দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি আলীর পদচ্যুতি অনুমোদন করলাম এবং তদ্‌স্থলে মুয়াবিয়াকে নিযুক্ত করলাম।' এ সালিশীর রায়ে খলিফার সমর্থকগণ ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হয়ে উঠল। উভয়পক্ষ চিরস্থায়ী প্রতিশোধের শপথ নিয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হল। আমরের কূটনীতিতে পরাস্ত হয়ে আলী (রা)-র পক্ষের লোকজন অত্যন্ত ক্ষুণ্নমনে কুফায় প্রত্যাগমন করেন।

হযরত আলীর সেনাবাহিনীর একটি অংশ যুদ্ধবিরতিতে রাজি ছিল না। তারা এখন সালিশীর রায়ে অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত আলীর দল ত্যাগ করেন। এরাই ইতিহাসে 'খারিজী' নামে পরিচিত। সালিশের ফলে সমস্যার সমাধান তো হলই না বরং সমস্যা আরো জটিলতর হয়ে উঠল।

এতদিন পর্যন্ত মুয়াবিয়া শুধু সিরিয়া প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন আর হযরত আলী (রা) ছিলেন সমগ্র মুসলিম জাহানের যথার্থ খলিফা। খলিফার সাথে একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তার খেলাফত ভাগ কিংবা তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা শুধু অবান্তরই নয়, অযৌক্তিকও বটে। এই সালিশী খিলাফতের উপর মুয়াবিয়ার কাল্পনিক দাবি প্রতিষ্ঠিত করে এবং খলিফা আলীকে তাঁর সাথে সমমর্যাদা দান করে— যা সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক এবং বে-আইনী বটে। খেলাফত প্রশ্নে জনগণের রায় চূড়ান্ত। এ বিষয়ে আবু মুসা কিংবা আমরের কোন প্রকার রায় প্রদান করার অধিকার নেই। কাজেই তাদের ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত জনসাধারণ গ্রহণই বা করবে কেন? তাছাড়া, সমস্যা সমাধানের জন্য হাদিস ও কুরআনের পরিবর্তে শঠতা ও হঠকারিতার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। এ সালিশী সকলদিক দিয়ে ন্যায়সঙ্গত খলিফা হযরত আলী (রা) র মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে। এর প্রস্তাব, বৈঠক এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সবগুলোই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।

ধর্মের ব্যাপারে খারিজিগণ ছিল গোঁড়াপন্থী। ইসলামের ৫টি স্তম্ভ (ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত) যদি কোন মুসলমান পালনে ব্যর্থ হন, তাকে খারিজিগণ কাফের বলে গণ্য করত।

বিদ্রোহী খারিজিগণ হযরত আলী, আমীর মুয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আসকে মুসলিম সমাজের শান্তির শত্রু হিসেবে দায়ী করে। তাই তারা নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে এই তিনজন নেতাকে হত্যা করতে ষড়যন্ত্র করে এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা তিনজন আততায়ীকে কুফা, দামেশ্‌ক এবং ফোসতাতে প্রেরণ করে। সৌভাগ্যক্রমে নির্দিষ্ট দিনে আমর মসজিদে হাজির হয়নি এবং মুয়াবিয়া সামান্য আহত হলেও রক্ষা পেলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে খলিফা হযরত আলী ২৭শে জানুয়ারী (১৭ই রমজান, ৪০ হিঃ) তিনি শাহাদৎ বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই খুলাফায়ে-রাশেদীনের পবিত্র খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে।

হযরত আলী এবং মুয়াবিয়ার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছিল তার ফলাফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ছিল। দুমা'র মীমাংসা গ্রহণ করার ফলে খলিফাকে নানা প্রকার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এর পূর্বে মুয়াবিয়া একজন ন্যায়সঙ্গত খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী গভর্নর ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মিসর ও সিরিয়ার যাবতীয় কর্তৃত্ব এবং প্রভুত্ব মুয়াবিয়ার উপর ছেড়ে দিয়ে হযরত আলী (রা) তাঁর সাথে এক সন্ধি সম্পাদন করে খিলাফতকে সংকুচিত করেন। এতে খিলাফতের বৈশিষ্ট্য এবং বুনিয়াদ ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে।

যদি স্বার্থপর মুয়াবিয়া খলিফা আলীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতেন, তাহলে তিনি খলিফা হিসাবে সফলতা অর্জন করতে পারতেন। তাই জার্মান ঐতিহাসিক ফন ক্রেমার যথার্থই বলেছেন– "If the conflict between Ali and

Muawiyah had never occurred, and the later days of Islam continued without a cloud, the future of the Muslim would have been happier and perhaps more successful". অর্থাৎ "যদি আলী এবং মুয়াবিয়ার মধ্যে কোন সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত না হত, তাহলে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য আরো প্রীতিকর এবং সম্ভবতঃ অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হত।"

হযরত আলী (রা)-এর স্বভাব-চরিত্র রাসূল জীবনের জ্বলন্ত নমুনা ছিল। এ বৈশিষ্ট্য শুধু হযরত আলী (রা)-এর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল যে, তিনি বাল্যকাল হতেই নবী-কোলে লালিত-পালিত হয়েছিলেন এবং নবী জীবনের নমুনা হিসাবে নিজেকে জগদ্বাসীর সম্মুখে তুলে ধরার যোগ্যতা লাভ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও তিনি এমন কোন কাজ করেননি, যা আল্লাহ্পাকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়। যেই সমুদয় অসদাচরণ নিয়া প্রতিটি আরববাসী গর্ব করত, হযরত আলী (রা) এর ধারেও যাননি। নম্রতা, ভদ্রতা ও এবাদত-বন্দেগী প্রভৃতি গুণে তিনি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন। সবর-শোকর, ধৈর্য-বীরত্ব ইত্যাদি ছিল তাঁর খোদাপ্রদত্ত গুণাবলী। খেলাফতের আমলে তাঁর দরজায় কোন প্রহরী পর্যন্ত ছিল না; আর তিনি রাজপ্রাসাদেও থাকতেন না। তিনি কোন চাকর-বাকরকে ব্যক্তিগত কাজে লাগাতেন না। নিজের কাজ নিজেই সমাধা করতেন। অথচ তাঁর চাকর-চাকরানীর কোন অভাবই ছিল না; তবুও তিনি নিজের কাজ নিজ হাতে করা অত্যন্ত পছন্দ করতেন। হযরত ফাতেমা (রা)-এর জীবনকালে এবং তাঁর পরেও তিনি সাদাসিধা চাল-চলন এবং সবর ও শোকর কখনো ত্যাগ করেননি। পুরাতন এবং ছেঁড়া কাপড়কেও তিনি কখনো ঘৃণা করেননি। মামুলী খাবারকেও তিনি অপছন্দ করেননি, যা পেতেন খেয়ে শোকর আদায় করতেন।

এবাদত-বন্দেগী তাঁর রূহানী খাদ্য ছিল। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "হযরত আলী (রা) সর্বপেক্ষা এবাদতগুজার ছিলেন এবং অধিকাংশ সময়ই রোযা রাখতেন।" হযরত যুবাইর ইবনে সাঈদ কোরাইশী (রা) বলেন, "কোন হাশেমীকেই আমি আলীর ন্যায় এবাদতগুজার দেখিনি।"

অহঙ্কার বলতে কোন কিছু তাঁর ধারে-কাছেও ছিল না। অনেক সময় তিনি মাটির উপরই বসে পড়তেন এবং মসজিদে নববীতে মাটির উপরেই শুয়ে পড়তেন। একদা তিনি মসজিদে মাটির উপর শুয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর অন্বেষণে মসজিদে তশরীফ নিয়া গেলেন। হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখে তৎক্ষণাৎ উঠে বসলেন। তখন তাঁর দেহে মাটি লেগেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর দেহের মাটি নিজ হাতে পরিষ্কার করতে করতে বললেন, "বস, হে আবু তোরাব (মাটির বাপ)!" সেদিন হতে হযরত আলী (রা) 'আবু তোরাব' বলে খ্যাত হন। তাঁকে আবু তোরাব বলে ডাকা হলে তিনি অত্যাধিক আনন্দিত হতেন।

বাহাদুরীতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। বদর হতে হুনাইন পর্যন্ত এবং জামাল হতে সিফফীন পর্যন্ত যেখানেই তিনি গিয়েছেন এবং যে যুদ্ধেই তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন, শত্রুপক্ষের সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। যেদিকেই তিনি আক্রমণ চালাতেন, শত্রুপক্ষের সর্বনাশ করে দিতেন। তাঁর মোকাবেলা করতে কেউই সাহস করত না। বিভিন্ন জেহাদের ময়দানে তিনি স্বীয় বাহাদুরীর যে প্রমাণ দিয়েছিলেন, উহা বর্ণনাতীত। অনেক সময় দেখা গেছে, হযরত আলী (রা) শত্রুর মোকাবিলা করছেন আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাগ্রহে আলীর যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছেন। হযরত আলী শত্রুকে ধরাশায়ী করছেন আর সে সঙ্গেই রাসূল (সা) ধ্বনি তুলছেন, 'না'রায়ে তকবীর–আল্লাহু আকবর'।

মানুষের প্রতি তাঁর দয়া ছিল অপরিসীম। শত্রু হোক বা মিত্র, কারো প্রতি তিনি অমানুষিক ব্যবহার করেননি। এমন কি জঙ্গে জামালে শত্রুপক্ষ পলায়ন করার সময় তিনি নিষেধ করলেন, যারা আত্মরক্ষার্থে পলায়ন করছে, কেহ তাদের পেছনে ধাওয়া করে তাদিগকে মারবে না।" ঘোরতর যুদ্ধের সময় পর্যন্ত তিনি কারো মর্যাদার হানি করেননি।

এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষ পূর্বাহ্নেই ফোরাত দখল করেছিল। হযরত আলী (রা)-র সৈন্যদের জন্য পানি ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু হযরত আলী (রা) বলপূর্বক কেবল ফোরাতই দখল করলেন না; বরং, শত্রুদের জন্যও পানি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করলেন।

হযরত আলী (রা) পূর্ববর্তী খলিফাত্রয়ের সর্বপ্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁর পরামর্শ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হত। বিশেষত হযরত ওমর (রা) হযরত আলী (রা)-র পরামর্শে ব্যক্তিগত মতামত পর্যন্ত পরিবর্তন করতেন। নেহাওন্দের যুদ্ধে হযরত ওমর (রা) নিজেই সেনাপতি হিসাবে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু হযরত আলী (রা) বললেন, "আপনার যাওয়া ঠিক হবে না।" হযরত আলীর এ কথা শ্রবণ করেই তিনি ঘোড়া হতে নেমে পড়েন। তিনি খলিফাত্রয়কে সর্বদা সৎ পরামর্শই দিতেন। যখনই কোন ভুল-ভ্রান্তি হতে দেখতেন, তৎক্ষণাৎ বাধা দান করতেন।

বিচার কার্যাবলী হযরত আলী (রা)-এর খেলাফত আমলের তথা তাঁর জীবনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে সর্বাপেক্ষা উত্তম বিচারক বলে অভিহিত করেন। তিনি তাঁর বিচারে আনন্দিত হতেন এবং বলতেন, "আমার মতেও বিচার ঠিক এ রকম হওয়া উচিত যা আলী করেছে।"

হযরত আমীর মো'আবিয়া (রা) রাজনৈতিক দিক হতে যদিও হযরত আলীর (রা) বিপক্ষে ছিলেন, তবুও তিনি হযরত আলী (রা)-এর চারিত্রিক গুণাবলীর

ভূয়সী প্রশংসা করতেন এবং নিজেও সেই চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার চেষ্টা করতেন। আমীর মো'আবিয়া (রা) হযরত আলী (রা)-এর পুরাতন বন্ধু হযরত যেরার ইবনে যামরার কাছে হযরত আলীর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেছেন, "অত্যন্ত দূরদর্শী, দুঃসাহসী, শক্তিশালী, ন্যায়বিচারক, প্রতিটি কথা এল্‌ম ও হেকমতে পরিপূর্ণ, দুনিয়া ও দুনিয়ার নেয়ামতের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা পোষণকারী, রাত জাগরণে আনন্দিত, পরকালের চিন্তায় মগ্ন, ঋতু এবং যুগ পরিবর্তনে আশ্চর্যান্বিত, সাদাসিধা পোশাক পরিধানকারী, সাধারণ আহার্যে অভ্যস্ত, মানবতার দিশারী, দানবীর, গরীবদের প্রতি আন্তরিক এবং স্নেহবান, ন্যায়ের সমর্থন ও অন্যায়ের ঘোর বিরোধিতা ছিল হযরত আলী (রা)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।' বস্তুত হযরত আলী (রা)-র গুণাবলী লিখতে গেলে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থই রচনা করতে হয়। (তিরমিযী)

হযরত আলী (রা) বিভিন্ন সময়ে কয়েক বিয়ে করেছিলেন। তাঁর প্রথম বিয়ে হযরত ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সম্পন্ন হয়। তাঁর গর্ভে হযরত ইমাম হাসান (রা), হযরত ইমাম হোসাইন (রা) হযরত মোহসেন (রা), মেয়েদের মধ্যে হযরত যাইনাব (রা) এবং হযরত উম্মে কুলসুম (রা) জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মোহসেন (রা) বাল্যকালেই মারা যান। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফরের সাথে হযরত যাইনাবের বিয়ে হয়। কিন্তু তাঁর বংশধর কেউ নেই। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর সাথে হযরত উম্মে কুলসুমের বিয়ে হয়।

হযরত ফাতেমা (রা) জীবিত থাকাকালে হযরত আলী (রা) অন্য কোন বিয়ে করেননি। অবশ্য এরপর তিনি একাধিক বিয়ে করেন। তন্মধ্যে–

১. উম্মুল বনীন বিনতে হাযাম। তাঁর গর্ভে আব্বাস, জাফর, আবদুল্লাহ্ এবং ওসমান জন্মগ্রহণ করেন। এরা সবাই হযরত ইমাম হোসাইন (রা)-এর কারবালার রণাঙ্গনে শাহাদতবরণ করেন।

২. লাইলা বিনতে মাসঊদ। তাঁর গর্ভে আবদুল্লাহ্ এবং আবুবকর জন্মগ্রহণ করেন। এরাও ইমাম হোসাইন (রা)-এর সাথে কারবালায় শহীদ হন।

৩. আসমা বিনতে উমাইস। ইনি প্রথমে হযরত জাফর ইবনে আবী তালেব অতঃপর হযরত আবুবকর (রা)-এর বিবাহে আসেন। সর্বশেষে হযরত আলী (রা)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর সাথেই ছিল মোহাম্মদ ইবনে আবুবকর। তাঁর গর্ভে আসগর এবং ইয়াহইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

৪. সাহ্‌বা (উম্মে হাবীব) বিনতে রবীআ। তাঁর গর্ভে ওমর এবং রোকাইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ওমর দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন।

৫. উমামা বিনতে আবিল আস। তাঁর গর্ভে মোহাম্মদের জন্ম হয়।

৬. খাওলা বিনতে জাফর। মোহাম্মদ ইবনে হান্‌ফিয়া তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। ইতিহাসে তাঁর খ্যাতি অপরিসীম।

৭. উম্মে সাঈদ বিনতে উরওয়া। তাঁর গর্ভে উম্মুল হাসান এবং রমলা জন্মগ্রহণ করেন।

৮. মুহ্‌য়াত বিনতে ইমরাউল কাইস। তাঁর গর্ভে মাত্র একটি মেয়ের জন্ম হয় এবং কয়েকদিন পরই মারা যায়।

হযরত আলী (রা)-এর সন্তানদের মধ্যে মাত্র তিনজন সন্তান এমন আছেন, যাঁদের বংশধর রয়েছে। অপর কারো বংশ পরবর্তীকালে ছিল না এবং আজ পর্যন্তও নেই। যাঁদের বংশ আছে তাঁদের নাম হল– হযরত ইমাম হাসান (রা), হযরত ইমাম হোসাইন (রা) এবং হযরত মোহাম্মদ ইবনে হানফিয়া (রা)। এদের মধ্যে মোহাম্মদ ইবনে হানফিয়ার বংশধর ব্যতীত ইমাম হাসান (রা) এবং ইমাম হোসাইন (রা)-এর বংশধরদিগকে সৈয়দ বলা হয়। কারণ, তাঁদের বংশধারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়।

রাসূল (সা) একবার বলেছিলেন, আমি জ্ঞানের নগরী ও আলী তার দ্বারস্বরূপ। এক কথায় খলিফা হিসেবে ব্যর্থ হলেও মানুষ হিসেবে তিনি পূর্ণ সফলতা অর্জন করেছিলেন। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, Valiant in battle, wise in counsel, eloquent in speech, true to his friends, magnanimous to his foes, he become both the paragon of moslem nobility and chivalry." অর্থাৎ "সাহসী, পরামর্শ দানে বিজ্ঞ বক্তৃতায় স্বচ্ছ-সাবলীল, বন্ধুদের প্রতি অকপট এবং শত্রুদের প্রতি দয়াশীল আলী ছিলেন মাহাত্ম্য ও শৌর্য বীর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনস্বরূপ।"

হযরত আলী (রা)-র গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে মাসুদীও বলেন, "আল্লাহ্ তাঁকে (আলীকে) যে গুণরাজি দ্বারা বিভূষিত করেছেন, তা তাঁর পূর্ববর্তী (একজন ছাড়া) অথবা পরবর্তী কারো মধ্যে আমরা খুঁজে পাব না।"

হযরত তালহা (রা)

একবার বনী ওযরার তিন ব্যক্তি মদীনা আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "এ মেহমানত্রয়ের লালন-পালনের ভার কে নিবে?" তৎক্ষণাৎ একজন দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি নিচ্ছি ইয়া রাসূলুল্লাহ্।' তারপর তিনি সানন্দে মেহমান তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে স্বীয় ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। এদের মধ্যে দুজন পর পর দুটি জেহাদে শাহাদতবরণ করেন। তৃতীয়জনও কিছুকাল পর তাঁর ঘরে ইন্তেকাল করেন। মেহমানদের সাথে তাঁর এমন ভালবাসা জন্মিয়ে গিয়েছিল যে, তিনি প্রায়ই সেই মেহমানদের কথা বলতেন। এমন কি, স্বপ্নেও তঁদের দর্শন লাভ করতেন।

তিনি বন্ধু-বান্ধবদের কাজ করে দিতে কুণ্ঠিত তো ছিলই না; বরং তাতেই যেন তাঁর আনন্দ হত। একদা জনৈক বেদুইন তাঁর মেহমান হল এবং অনুরোধ করল, বাজারে গিয়ে আমার উটটি বিক্রয় করে দিন। তিনি বললেন, "যদিও রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করেছেন, কোন শহরবাসী অপর কোন বেদুইনের কাজ করবে না। তবুও আমি তোমার কাজ করে দিচ্ছি।" এ বলে তিনি বেদুইনটির সাথে বাজারে গিয়ে উচিত মূল্যে উটটি বিক্রয় করে দিলেন। বেদুইন অতঃপর অনুরোধ জানাল, "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হতে যাকাতের নিয়ম জেনে দিলে উসুলকারীদেরকে সে নিয়ম মোতাবেক যাকাত দিতে পারব।" তিনি স্বীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হতে যাকাতের নিয়ম জেনে নিয়ে বেদুইনের সেই আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ করে দিলেন।

তাঁর প্রকৃত নাম ছিল তালহা। কুনিয়াত আবু মোহাম্মদ ফাইয়্যায এবং খাইর ছিল তাঁর উপাধি। পিতার নাম ওবাইদুল এবং মাতার নাম সোবাহ্। বংশগত শাজারা এরূপ– তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ্, ইবনে ওসমান, ইবনে আমর, ইবনে কা'ব, ইবনে সা'দ, ইবনে তামীম, ইবনে মুর্‌রা, ইবনে কা'ব। তালহা (রা)-এর বংশগত সম্পর্ক সপ্তম পুরুষে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শাজারা মোবারকের সাথে মিলিত হয়েছে।

হযরত তালহা (রা)-এর পিতা ওবাইদুল্লাহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওত লাভের পূর্বেই ইহকাল ত্যাগ করেছিলেন। অবশ্য হযরত তালহা (রা)-এর মাতা হযরত সোবাহ্ (রা) বহুদিন জীবিত ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনায় হিজরতের চব্বিশ কি পঁচিশ বছর পূর্বে হযরত তালহা (রা)-এর জন্ম হয়। তাঁর শৈশবকাল সম্পর্কে জানা যায়নি। অবশ্য ইতিহাস মারফত এতটুকু দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, ছেলেবেলা হতেই তিনি ব্যবসার কাজে সংশ্লিষ্ট হন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই ব্যবসা উপলক্ষে দেশ-বিদেশে গমন করার সুযোগ পান।

হযরত তালহা (রা)-এর বয়স যখন সতের-আঠার বছর, তখন একদা ব্যবসা উপলক্ষে বসরা গমন করেন। তথায় জনৈক পাদ্রী তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওত প্রাপ্ত হওয়ার সুসংবাদ জানায়। কিন্তু জন্মের পর হতে এ পর্যন্ত যে পরিবেশে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন, তার ফলে উক্ত পাদ্রীর কথার বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া তাঁর মধ্যে দেখা দিল না। মক্কা প্রত্যাবর্তন করার পর হযরত আবুবকর (রা)-এর নিঃস্বার্থ ওয়ায-নসীহত দ্বারা হযরত তালহা (রা)-এর অন্তর হতে ইসলাম সম্পর্কীয় সন্দেহ দূরীভূত হয়। অতএব, তিনি আবুবকর (রা)-এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে হযরত তালহা (রা) সে আটজন সাহাবীর মধ্যে একজন বলে সুখ্যাতি অর্জন করেন, যাঁরা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম-সূর্যরূপে পরিগণিত হন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত তালহাও অপরাপর মুসলমানদের ন্যায় মুশরিকীনের যুলুম-অত্যাচার হতে রেহাই পাননি। হযরত তালহা (রা)-এর আপন ভাই ওসমান ইবনে ওবাইদুল্লাহ্ বড়ই নির্দয় লোক ছিল। সে হযরত তালহা (রা) ও হযরত আবুবকর (রা)-কে রশিতে বেঁধে নুতন ধর্ম ত্যাগ করার জন্য অত্যধিক মারপিট করে। কিন্তু তাঁদের ইসলামের প্রতি প্রেম এত গভীর ছিল যে, এত মারপিট সত্ত্বেও তাঁরা ইসলাম ত্যাগ করেননি।

হযরত তালহা (রা) মক্কায় নীরব জীবন-যাপন করেন এবং নিজের ব্যবসায়ে মনোযোগী থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হযরত আবুবকর (রা)-এর সাথে মদীনায় হিজরত করেন, তখন হযরত তালহা (রা)-এর ব্যবসায়ীদল শাম দেশ হতে প্রত্যাবর্তন করছিল। পথে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর খেদমতে শাম দেশীয় কিছু উত্তম কাপড় পেশ করেন। অতঃপর আরয করেন, মদীনাবাসীগণ অত্যধিক আগ্রহ সহকারে আপনাদের অপেক্ষা করছেন।' বেশি বিলম্ব না করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার দিকে অগ্রসর হন। এদিকে তিনি মক্কা প্রত্যাবর্তন করে ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করে হযরত আবুবকর (রা)-এর পরিবার-পরিজনকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা পৌঁছেন। হযরত আসআদ ইবনে যেরারা (রা) তাঁকে নিজের মেহমানরূপে গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর সাথে তাঁর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করে দেন।

হিজরতের দ্বিতীয় সন হতে জেহাদের অভিযান আরম্ভ হয়। ইসলাম এবং মুশরিকীনের মধ্যে সর্বপ্রথম যুদ্ধ বদর প্রান্তরে সংঘটিত হয়। বিশেষ কারণে এ যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে মালে গনীমতের অংশ প্রদান করে বললেন, "তুমি জেহাদের সওয়াব হতেও মাহরূম হবে না।"

হিজরী তৃতীয় সনে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে প্রথম দিকে মুসলমানদের জয় হয়েছিল এবং মুশরিকদল পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিল। কিন্তু মুসলমানগণ নিজ নিজ দায়িত্ব ত্যাগ করে মালে গনীমত কুড়াতে লাগল। এ সুযোগে মুশরিকদল অতর্কিতে পাল্টা আক্রমণ করে। এই অতর্কিত আক্রমণে মুসলমানগণ এমনই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হেফাযতের কথা পর্যন্ত তাঁদের মনে থাকেনি বরং যে যে দিকেই পথ পেয়েছে পলায়ন করেছে। রণক্ষেত্রে মাত্র দশ-বার জন বীর অটল-অবিচল থাকেন। কিন্তু তাঁরাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ছিলেন না; বরং দূরে ছিলেন। কেবল হযরত তালহা (রা) একাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হেফাযতে অতুলনীয় বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। চতুর্দিক হতে মুশরিকীনের তীর বর্ষিত হচ্ছিল। রক্তপিপাসু তরবারির চমক চোখ ঝলসিয়ে দিচ্ছিল। সহস্রাধিক মুশরিকীন শুধু এক ব্যক্তির তথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এরই রক্তপিপাসু ছিল। এমন ভয়াবহ সময় হযরত তালহা (রা) একাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চতুর্দিকে বেষ্টন করে কখনো ডানদিকে কখনো বামদিকে আবার কখনো সম্মুখে আবার কখনো পিছনের দিকে অবস্থান করে মুশরিকীনের আক্রমণ প্রতিরোধ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হেফাযত করেছিলেন। তীরের আক্রমণ নিজ হাতের উপর, লেজা এবং তলোয়ারের আক্রমণ নিজ বক্ষের উপর সামলিয়ে নিতেন।

এভাবে হযরত তালহা (রা) বহুক্ষণ ধরে বীরত্বের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হেফাযত করেছিলেন। পরে অন্যান্য সাহাবীগণও সাহায্যার্থে আসেন। ফলে মুশরিকীনের আক্রমণের তীব্রতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। অতঃপর হযরত তালহা (রা) স্বীয় পৃষ্ঠে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বসিয়ে নিয়ে পাহাড়ের উপর পৌঁছিয়ে দিয়ে কাফেরদের হাত থেকে রক্ষা করেন।

মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধেও মুসলমানদের অবস্থা কিছুটা ওহোদের যুদ্ধের ন্যায় হয়েছিল। অর্থাৎ, প্রথমে মুসলমানদের পরাজয় সুনিশ্চিত হয়ে পড়ল। কিন্তু কয়েকজন মুসলমান বীরের অবিচলতার ফলে কাফেরদের জয় পরাজয়ে পরিণত হল। কাফেরেরা অসংখ্য মাল-সম্পদ ছেড়ে পলায়ন করল। যাঁদের অসীম বীরত্বের ফলে মুসলমানদের পরাজয় বিজয়ে পরণত হয়েছিল, হযরত তালহা (রা) ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

হিজরী নবম সনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সংবাদ পেলেন যে, কাইসারে রোম প্রচুর পরিমাণে সমরাস্ত্র নিয়ে আরব দেশ আক্রমণ করার সংকল্প নিয়েছে। তাই তিনি সাহাবীগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমরাস্ত্র সংগ্রহ করার জন্য অর্থ সাহায্যেরও আবেদন জানাল হল। হযরত তালহা (রা) এ সময় মোটা অঙ্কের চাঁদা দান করেন। এ চাঁদার ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে 'ফাইয়্যায' উপাধিতে ভূষিত করেন।

দশম হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জ করেন। তখনো হযরত তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। হজ্জব্রত সমাপনান্তে মদীনা প্রত্যাবর্তন করে হিজরী এগার সনের বারই রবিউল আউয়াল রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইন্তেকাল করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তেকালে হযরত তালহা (রা) এতই শোকাভিভূত হয়েছিলেন যে, খলিফা নির্বাচনের সময়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন না; বরং একাকী এক জায়গায় বসে ক্রন্দন করেছেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খলিফা মনোনীত হওয়ার কয়েকদিন পর তিনি তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে সর্বদা তিনি আবুবকর (রা)-কে পরামর্শ দান করতেন এবং তাঁর পরামর্শ অত্যন্ত মূল্যবান বলে প্রমাণিত হত।

সোয়া দুই বছর পর হযরত আবুবকর (রা) মৃত্যুশয্যায় শায়িত হন। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি খলিফা পদের জন্য হযরত ওমর (রা)-এর নাম ঘোষণা করেন। এ ঘোষণা শ্রবণ করে হযরত তালহা (রা) দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, "আপনার উপস্থিতিতে হযরত ওমর (রা) আমাদের সাথে কি রকম ব্যবহার করেন? আবার এখন আপনিই খলিফা পদের জন্য তাঁর নাম ঘোষণা করছেন। তখন তিনি আমাদের সাথে কি রকম ব্যবহার করবেন? আপনি তো আল্লাহ্র কাছে গমন করেছেন। যাওয়ার পূর্বেই চিন্তা করে দেখুন, খোদার কাছে আপনি কি জওয়াব দিবেন?" হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, "আমি আল্লাহ্র কাছে গিয়ে বলব যে, আমি আপনার বান্দাদের জন্য সেই ব্যক্তিকেই আমীর নিযুক্ত করেছি, যিনি সকল দিক দিয়েই সর্বাপেক্ষা উত্তম।"

হযরত ওমর (রা) সম্পর্কে উপরিউক্তরূপ অভিমত একা হযরত তালহা (রা)-রই ছিল না; বরং অধিকাংশ সাহাবীর মতামতই তাঁর মতামতের অনুরূপ ছিল। কারণ, হযরত ওমর (রা)-এর অবলম্বিত কঠোর ব্যবস্থাদি কেউ সহ্য করতে পারত না। তাঁর মেযাযই ছিল কঠোর ধরনের। কিন্তু খলিফা হওয়ার পর হযরত ওমর (রা) স্বীয় কর্মপদ্ধতি দ্বারা যখন প্রমাণ করে দিলেন যে, এ গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য তিনিই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যক্তি, তখন হযরত তালহা (রা) স্বীয় মতামত পরিবর্তন করেন এবং হযরত ওমর (রা)-এর পরামর্শ সভার

একজন উল্লেখযোগ্য সদস্য হিসেবে সর্বদা তাঁর সাহায্য করেন। কোন বিষয়ে সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হলে তিনি হযরত ওমর (রা)-এর সাথে ঐক্যমত পোষণ করতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিঃস্বার্থভাবে তাঁকে পরামর্শ দান করতেন।

হিজরী তেইশ সনে হযরত ওমর (রা)-এর ইন্তেকালের পূর্বে তিনি স্বয়ং খলিফা পদের জন্য ছয়জন বুযুর্গের নাম উল্লেখ করেন। সে ছয়জনের মধ্যে হযরত তালহাও ছিলেন। কিন্তু হযরত তালহা (রা) স্বেচ্ছায় হযরত ওসমান (রা)-কে নিজের চেয়ে অধিক যোগ্য বলে দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করেন। অতএব, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-এর প্রচেষ্টায় এবং হযরত তালহা (রা)-এর সমর্থনে হযরত ওসমান (রা) খলিফা নির্বাচিত হন।

হযরত ওসমান (রা) বার বছর পর্যন্ত খলিফা পদে অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু শেষ ছয় বছর সমগ্র ইসলামি রাষ্ট্র বিদ্রোহীদের ফাসাদে কলুষিত হয়ে উঠে। হযরত তালহা (রা) খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওসমান (রা)-এর খেদমতে হাজির হয়ে পরামর্শ দিলেন যে, "বিদ্রোহের কারণ তদন্তের জন্য স্থানে স্থানে কমিটি নিয়োগ করা হোক।" এ পরামর্শ গৃহীত হল। অতএব, হিজরী পঁয়ত্রিশ সনে হযরত মোহাম্মদ ইবনে মুসলেমা (রা), হযরত উসামা ইবনে যাইদ (রা), হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা)-কে দেশের বিভিন্ন স্থানে তদন্তের জন্য নিয়োগ করা হল। নিয়োজিত বুযুর্গগণ তদন্তের পর যা কিছু রিপোর্ট পেশ করলেন, উহা কার্যকরী হওয়ার পূর্বেই বিদ্রোহীরা হযরত ওসমান (রা)-এর ঘর অবরোধ করে ফেলে। হযরত তালহা (রা) তখন বয়সের দিক দিয়ে বৃদ্ধ ছিলেন, তাই তিনি হযরত ওসমান (রা)-এর বিশেষ কোন সাহায্য করতে সক্ষম না হলেও নিজে নিরপেক্ষ থেকে পরিস্থিতির অবগতির জন্য মাঝে মাঝে বিদ্রোহীদের সাথেও মিলিত হতেন।

একবার তিনি বিদ্রোহীদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় হযরত ওসমান (রা) ঘরের ছাদের উপর দণ্ডায়মান হয়ে যেই কয়জন বড় বড় সাহাবাগণের এক-একজনের নাম ধরে ডাকলেন, তাদের মধ্যে হযরত তালহা (রা)-ও ছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ আমি আছি।" অতঃপর হযরত ওসমান (রা) জনসাধারণের প্রতি যেসব এহসান করেছেন তার স্বীকারোক্তি তলব করেন। হযরত তালহা (রা) বিনা-দ্বিধায় বিদ্রোহীদের সম্মুখেই ঐ সমস্ত স্বীকার করেন।

অবশেষে বিদ্রোহীদের অবরোধ যখন ভয়ানক আকার ধারণ করে, তখন হযরত আলী (রা) এবং হযরত যুবাইর (রা)-এর ন্যায় হযরত তালহা (রা)-ও নিজের ছেলে হযরত মোহাম্মদ ইবনে তালহা (রা)-কে হযরত ওসমান (রা)-এর

হেফাযতের জন্য নিযুক্ত করেন। অতএব বিদ্রোহীরা যখন আক্রমণ করে, তখন হযরত মোহাম্মদ ইবনে তালহা (রা) অত্যধিক বীরত্বে সাথে উহার মোকাবিলা করেন। তবুও বিদ্রোহীদের হাতে হযরত ওসমান (রা) শাহাদাতবরণ করেন।

হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদত একটা জঘন্য দুর্ঘটনা ছিল। ফলে সমগ্র দেশে বিশৃঙ্খলা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এমনকি, বিদ্রোহীদের প্রভাবে স্বয়ং মদীনায়ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করতে থাকে।

হযরত তালহা (রা) অনবরত চার মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করেন, হয়তো শৃঙ্খলা ফিরে আসতে পারে। চার মাস পর্যন্ত যখন দরবারে খেলাফতের পক্ষ হতে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় খুব একটা উন্নতি দেখা গেল না, তখন তিনি নিরাশ হয়ে এর সংস্কারকল্পে হযরত যুবাইর (রা)-সহ মদীনা হতে মক্কা গমন করেন। হযরত আয়েশা (রা) হজ্জব্রত পালনার্থে মক্কা আগমন করছেন এবং মদীনার পরিস্থিতি অবগত হয়ে তখন পর্যন্ত মক্কায়ই অবস্থান করেছিলেন। তাই এ বুযুর্গদ্বয় সর্বপ্রথম উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর খেদমতে হাজির হয়ে মদীনার পরিস্থিতি বর্ণনা করেন এবং এ বিশৃঙ্খল অবস্থার সংস্কারের জন্য তাঁকে সম্মত করেন। সামান্য আলোচনার পর হযরত আয়েশা (রা) এ কাজের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। হযরত তালহা (রা)-এর মতানুযায়ী প্রথমে বসরা যাওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হল। কারণ, বসরায় হযরত তালহা (রা)-এর সমর্থক বহু পরিমাণে ছিল। তাই তাঁরা ধারণা করেছিলেন, তথায় এ অভিযানের জন্য বিপুলসংখ্যক লোক একত্র করা সম্ভব হবে। এতদ্ভিন্ন মিসরীয় বিদ্রোহীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বনু উমাইয়ার বহু লোকও মদীনা ত্যাগ করে মক্কায় আশ্রয় নিয়েছিল। তারাও এই সংস্কার প্রয়াসীদের দলে মিলিত হল। এভাবে একহাজার ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত এ দল বসরা গমন করল। বসরার নিকটে পৌঁছলে তথাকার গভর্ণর ওসমান ইবনে হানীফ তাঁদেরকে বাধা দিলেন। আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা বৃথা গেল। অবশেষে শক্তি প্রয়োগ করে বসরা অধিকার করে নেয়া হল এবং বসারাবাসী হযরত তালহা (রা)-এর সমর্থকগণ সদল বলে এ দলে শামিল হল।

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা ও হযরত তালহা (রা)-এ আগমন এবং যুদ্ধ-প্রস্তুতি ইত্যাদি সম্পর্কে হযরত আলী (রা) অবগত ছিলেন। তাই তিনি মদীনা হতে রওয়ানা হয়ে যীকার নামক স্থানে আগমন করেন। এখান হতেই কুফাবাসীদের হতে অন্তত নয় হাজার যোদ্ধা সংগ্রহ করে বসরার দিকে অগ্রসর হন। হযরত তালহা এবং হযরত যুবাইর (রা) তাঁর আগমন এবং যোদ্ধাদের খবর শ্রবণ করে সৈন্যদের প্রস্তুত করলেন। অতঃপর হিজরী ছয়ত্রিশ সনের দশম জমাদিউল ওখরা উভয় দল মুখোমুখি হয়।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আপোষ-মীমাংসার জন্য উভয় দলের নেতৃবৃন্দ জোর প্রচেষ্টা চালান। ইত্যবসরে হযরত আলী (রা) হযরত যুবাইরকে ডেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করে দেন। সঙ্গে সঙ্গেই হযরত যুবাইর (রা) মতামত পরিবর্তন করে এ যুদ্ধ হতে বিরত হন।

হযরত তালহা (রা) স্বীয় ডান হস্ত হযরত যুবাইরকে যুদ্ধ না করার সঙ্কল্প নিতে দেখে নিজেও যুদ্ধ হতে বিরত থাকার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। মারওয়ান–যে হযরত ওসমান (রা)-এর যুদ্ধ বিরতির সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে তাঁর দিকে তীর নিক্ষেপ করে। তীর যদিও পায়ে লেগেছিল; কিন্তু এ তীরই হযরত তালহা (রা)-এর জন্য মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল।

হিজরী ৩৬ সনে হযরত তালহা (রা) ইন্তেকাল করেন। শাহাদতের সময় হযরত তালহা (রা)-এর বয়স বাষট্টি অথবা চৌষট্টি বছর ছিল।

হযরত তালহা (রা) ছিলেন দান-দক্ষিণার বেলায় খুবই উদার। ফকির-মিসকীন এবং গরীবদের জন্য তাঁর দরজা সর্বদাই উন্মুক্ত থাকত। কাইস ইবনে আবী হাযেম বলেন, "আমি হযরত তালহা ব্যতীত এমন আর কোন লোক দেখিনি, কিছু চাওয়ার আগেই যে দান করে।"

আতিথেয়তা হযরত তালহা (রা)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি প্রকৃতিগতভাবে এমন ছিলেন যে, বন্ধু-বান্ধবের আনন্দই স্বয়ং তাঁর আনন্দের কারণ হত।

হযরত তালহা (রা)-এর জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায় ছিল বাণিজ্য। অতএব, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাব সম্পর্কীয় সংবাদও এ বাণিজ্য মারফত অবগত হয়েছিলেন। অবশ্য হিজরতের পর মদীনায় তিনি কৃষিকার্য আরম্ভ করেন এবং ক্রমশ তা অধিক পরিমাণে বর্ধিত করেন। খাইবারের জমিদারী ব্যতীত ইরাকেও তাঁর জমিদারী ছিল। কানাত এবং সোরাত তাঁর প্রসিদ্ধ জমিদারী। এ উভয় এলাকায় কৃষিকার্যের বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। এমন কি, কানাতের জমিতেই প্রতিদিন বিশটি উট শুধুমাত্র পানি সেচের কাজ করত। এতদূভয় জমিদারীর দৈনিক আয় গড়ে একহাজার স্বর্ণমুদ্রা বা দীনার ছিল।

হযরত তালহা (রা)-এর দৈনন্দিন জীবনপ্রণালী অতি উত্তম ছিল। তিনি ছিলেন পরিবার-পরিজনের দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রিয়। স্বীয় পরিবারের সাথে তাঁর যেরূপ মহব্বত ছিল, তার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

হযরত যুবাইর (রা)

ফেস্তাতের কিল্লা এমনই দুর্ভেদ্য ছিল যে, অনবরত সাত মাস পর্যন্ত পাথর বর্ষণ চলতে থাকে বটে; কিন্তু জয়-পরাজয়ের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। অবশেষে বিরক্ত হয়ে যিনি বললেন, "আজ আমি মুসলমানদের জন্য কোরবানী দান করব।" এ বলে তিনি তরবারি বের করে সিঁড়ি লাগিয়ে কিল্লার দেওয়ালের উপর চড়েন। তাঁর সাথে আরো কয়েকজন সৈন্য দেওয়ালের উপর চড়ে। তাঁরা সজোরে না'রায়ে তকবীর আল্লাহু আকবর শ্লোগান দিলেন। সমস্ত কিল্লা কম্পমান হয়ে উঠল।

খ্রিস্টানরা মনে করল যে, মুসলমানগণ কিল্লার ভিতরে ঢুকে পড়েছে। তাই তারা হতবুদ্ধি হয়ে এদিক-সেদিক পলায়ন করতে আরম্ভ করে দিল। এ সুযোগে তিনি অনতিবিলম্বে কিল্লার ভেতরে প্রবেশ করে কিল্লার দরজা খুলে দেন। মুসলমানগণ কিল্লার ভেতরে ঢুকে পড়েন। মিসরের গভর্ণর মাকুকিস্ মুসলমানদের এ অবস্থা দেখে সন্ধির প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয় এবং সকলকে নিরাপত্তা দান করা হয়

তাঁর নাম যুবাইর। আবু আবদুল্লাহ্ কুনিয়াত এবং উপাধি ছিল হাওয়ারীয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)। পিতার নাম আওয়াম এবং মাতার নাম ছিল সফিয়্যা। বংশগত শাজরা ছিল নিম্নরূপঃ যুবাইর ইবনুল আওয়াম, ইবনে খোওয়াইলেদ, ইবনে আসাদ, ইবনে আবদুল ওয্যা, ইবনে কুসাই, ইবনে কেলাব, ইবনে মুররা, ইবনে কা'ব ইবনে লুওয়াই আল-কারশী আল-আসাদী।

হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়ামের শাজরা কুসাই ইবনে কেলার পর্যন্ত গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শাজরার সাথে মিলিত হয়েছে। আর হযরত যুবাইরের মাতা হযরত সফিয়্যা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফুফী ছিলেন। এভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফুফাতো ভাইও ছিলেন। এতদ্ব্যতীত হযরত যুবাইর (রা) উম্মুল মোমেনীন হযরত খাদীজা (রা)-এর আপন ভাতিজা এবং হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর জামাতা ছিলেন। এ হিসাবে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভায়রা ভাই ছিলেন। সারকথা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁর কয়েক প্রকারের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল।

হযরত যুবাইর (রা) হিজরতে নববীর আঠাশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশবকালের জীবনী সম্পূর্ণ জানা যায়নি। তবে তাঁর মাতা হযরত সফিয়্যা (রা) তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা এবং লালন-পালনের এমন সুবন্দোবস্ত করেছিলেন, যাতে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে একজন বীরপুরুষ, দূরদর্শী ও সাহসী সৈনিক হতে পারেন। তিনি হযরত যুবাইরকে বাল্যকালে অত্যধিক শাসন করতেন, ফলে তিনি কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত হন।

ইসলাম গ্রহণের পর একদা কেউ বলল যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গ্রেফতার করেছে। তা শুনে হযরত যুবাইর (রা) ক্রোধে এমনই আত্মহারা হয়ে যান যে, কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ তিনি নাঙ্গা তলোয়ার হাতে ভীড় অতিক্রম করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে গিয়ে হাজির হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যুবাইরের এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "যুবাইর! এসব কি?"

হযরত যুবাইর (রা) আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি জানতে পেরেছি যে, মুশরিকরা আপনাকে গ্রেফতার করেছে। তাই আমি তার প্রতিশোধ নিতে আগমন করেছি।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ কথা শ্রবণ করে আনন্দিত হলেন এবং হযরত যুবাইর (রা)-এর জন্য দোয়া করেন। ঐতিহাসিকদের মতে হযরত যুবাইর (রা)-এর এ তলোয়ার সর্বপ্রথম তলোয়ার, যা মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোষমুক্ত হয়েছে।

সাধারণ অত্যাচারিত মুসলমানদের ন্যায় হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়ামও মক্কার মুশরিকদের যুলুম-অত্যাচার হতে রেহাই পাননি। তাঁর চাচা সম্ভাব্য সবরকম প্রচষ্টো চালিয়েও তাঁকে ইসলাম হতে ফিরাতে অকৃতকার্য হন। তিনি ইসলামের উপর অটল-অবিচল থাকেন। অবশেষে তার চাচা ক্রুদ্ধ হয়ে আরো অধিক পরিমাণে যুলুম করতে আরম্ভ করে। এমনকি, তাঁকে হোগলায় পেঁচিয়ে বাঁধত এবং নাকে ধুঁয়া দিত। ফলে যুবাইরের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু তিনি বারংবার এ কথাই বলতেন যে, চাচা! আপনি যত অন্যায় এবং অমানুষিক অত্যাচারই করুন না কেন, আমি কিন্তু ইসলাম ত্যাগ করব না। মোটকথা, কেউ আমাকে ইসলাম ত্যাগ করাতে পারবে না।

এ সমস্ত যুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি হাব্শায় হিজরত করেন। কিছুদিন পর সেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা শরীফ হিজরত করেছেন। তাই তিনিও পুনরায় মক্কা ত্যাগ করে মদীনা শরীফকে নিজের দেশ এবং বাসস্থানরূপে গ্রহণ করেন।

মক্কা শরীফে রাসূলূল্লাহ (সা) হযরত তালহা (রা)-কে হযরত যুবাইর (রা)-এর ইসলামি ভাই বলেছিলেন। কিন্তু মদীনা পৌঁছার পর যখন মুহাজের এবং আনসারের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তখন হযরত সালামা

ইবনে সালামা আনসারী (রা)-এর সাথে হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)-এর ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন করা হয়।

হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) জেহাদে অংশগ্রহণের বেলায়ও সর্বাগ্রে ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে তিনি বীরবিক্রমে অংশগ্রহণ করেন। তিনি যেদিকেই তিনি আক্রমণ চালাতেন শত্রুপক্ষকে ছিন্নভিন্ন করে দিতেন। শত্রুপক্ষের জনৈক মুশরিক এক উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ডাকলে হযরত যুবাইর (রা) অগ্রসর হয়ে তার সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ধস্তাধস্তিতে উভয়েই গড়াগড়ি করে নীচের দিকে পতিত হতে লাগল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "এদের মধ্যে যে প্রথমে সমতল ভূমিতে এসে দাঁড়াবে, সে নিহত হবে।" ফলে তাই হল। সেই মুশরিকই প্রথমে সমতল ভূমিতে এসে পতিত হল এবং হযরত যুবাইরের হাতে নিহত হল।

ওহুদ যুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানের পিছন দিকে অবস্থিত পাহাড়ের গিরিপথ রক্ষায় নিয়োজিত তীরন্দজদের ভুল সিদ্ধান্তে মুসলমানের সুনিশ্চিত জয়কে পরাজয়ে পরিণত করে এবং মুশরিকদের অতর্কিত আক্রমণে তাদের মনোবল এক প্রকার সাহসহীনতায় পর্যবসিত হয়। এমন কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হেফাযতের জন্য মাত্র চৌদ্দ জন প্রাণ বিসর্জনকারী রহে গেছেন, তাঁরা ধৈর্যহারা হননি এবং অটল-অবিচলও ছিলেন। তখন, সেই প্রাণ বিসর্জনকারী হযরত যুবাইর (রা) দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

হিজরী পঞ্চম সনে ইহুদীদের ফাসাদ সমস্ত আরব জাহানের মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছে। মুসলমানদের জাতশত্রু কুফ্ফারে কোরাইশ যখন মদীনা আক্রমণ করে, তখন ইহুদীরা তাদের সাথে হাত মিলায়। রাসুলুল্লাহ্ (সা) মদীনার নিকট পরিখা খনন করে তাদের মোকাবিলা করে। এ পরিখা যুদ্ধে হযরত যুবাইর (রা) সেই স্থানে প্রহরারত ছিলেন, যেখানে মহিলাগণ ছিলেন।

ইহুদী গোত্র বনু কোরাইযা এবং মুসলমানদের মধ্যে চুক্তি ছিল। কিন্তু এ ফাসাদের সময় তারা চুক্তি ভঙ্গ করে বসল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহুদীদের অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য তিনবার বললেন, "সেই জাতির খবর আনবে কে?" হযরত যুবাইর (রা) প্রত্যেকবারেই সকলের আগে উত্তর দান করেন, "আমি আনব।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনন্দিত হয়ে বললেন, "প্রত্যেক নবীর জন্যই হাওয়ারী থাকে। আমার হাওয়ারী যুবাইর।"

পরিখা যুদ্ধের পর হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) বনু কোরাইযার যুদ্ধ এবং বাইআতে রেযওয়ানে শরীক হন। অতঃপর খাইবার অভিযানে অনন্য সাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দান করেন। মারহাব নামক জনৈক ইহুদী ছিল খাইবারের সরদার। উক্ত যুদ্ধে সে মারা গেলে তার ভ্রাতা ইয়াসির ক্রুদ্ধ হয়ে

ময়দানে অবতীর্ণ হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহ্বান জানায়। হযরত যুবাইর ইয়াসিরের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হন। ইয়াসিরের এমনই বলিষ্ঠ এবং দৈত্যাকৃতি দেহ ছিল, যা দর্শনে হযরত যুবাইরের মাতা হযরত সফিয়্যা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সন্তান আজ শহীদ হয়ে যাবে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "না না, যুবাইর শহীদ হবে না; বরং যুবাইর ইয়াসিরকে হত্যা করবে।" তাই ঘটল। অল্প সময়ের মেকাবিলার পরেই দেখা গেল, ইয়াসির দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল।

মুসলমানদের হাতে খাইবার জয় হল। এর পর মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হল। বিখ্যাত সাহাবী হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতাআ (রা)-এর পরিবারের অনেকেই মুশরিক ছিল এবং মক্কায় বাস করছিল। তাই তিনি তাদের আত্মরক্ষার খাতিরে একখানা চিঠিতে মদীনার মুসলমানদের অবস্থা এবং উদ্দেশ্য লিখে জনৈকা মহিলার মারফতে মক্কায় প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা অবগত হয়ে মহিলাটিকে গ্রেফতার করার জন্য একদল যুবককে পাঠিয়ে দেন। হযরত যুবাইরও এ দলেরই একজন সদস্য ছিলেন।

অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে রাসূল (সা) দশ হাজার মুজাহিদসহ মক্কাভিযান করেন যে, ভূমি হতে আট বছর পূর্বে বহু মুসীবত সহ্য করার পর অতিষ্ঠ হয়ে তিনি বের হতে বাধ্য হয়েছিলেন। দশ হাজার মুজাহিদকে ছোট-বড় কয়েক দলে বিভক্ত করেন। সবচাইতে ছোট এবং শেষ দলে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন এবং হযরত যুবাইর (রা) এ দলের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর মদীনা প্রত্যাবর্তনকালে হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঘাঁটির মধ্যে মুশরিকরা লুকায়িত থেকে মুসলমানদের তৎপরতা প্রত্যক্ষ করছিল। ইত্যবসরে হযরত যুবাইর (রা) ঘোড়ায় আরোহণ করে একাকী সেই ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হন। এক ব্যক্তি তাঁকে দেখে সঙ্গীদেরকে ডেকে বলল, "আমাদের প্রভু লাত এবং ওয্যার কসম! ঘোড়ায় আরোহী এ লম্বা ব্যক্তি নিশ্চয়ই যুবাইর হবে। সাবধান! প্রস্তুত হও এবং সকলে প্রস্তুত থাক। কারণ, যুবাইরের আক্রমণ অত্যন্ত মারাত্মক।" লোকটির এ সতর্কবাণী শেষ না হতেই একদল মুশরিক সৈন্য হযরত যুবাইরকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসল। হযরত যুবাইর (রা) অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা এবং সাহসের সাথে এ অকল্পনীয় আক্রমণ প্রতিহত করেন। এমন কি, তিনি একা সেই ঘাঁটির সমস্ত মুশরিকের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করেন। অবশেষে দেখা গেল যে, মুশকিরা তাদের সেই ঘাঁটি হতে পলায়ন করেছে।

হযরত আবুবকর (রা)-এর ইন্তেকালের পর হযরত ওমর (রা) খলিফা নিযুক্ত হন। প্রথম খলিফার আমলেই দেশ বিজয়ের অভিযান আরম্ভ হয়। হযরত

ওমর (রা) সমগ্র আরবে জেহাদের প্রেরণা জাগ্রত করে বিজয়াভিযানকে আরো প্রসারিত করেন। হযরত যুবাইর (রা) যদিও রাসূলূল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তেকালে শোকাভিভূত ছিলেন, তবুও একজন বীরপুরুষের জন্য জেহাদের সময় ঘরে বসে থাকা লজ্জার কথা বলে তিনি মনে করতেন। তাই তিনি হযরত ওমর (রা)-এর অনুমতি নিয়ে হযরত যুবাইর (রা) শাম দেশের রণক্ষেত্রে শামিল হন। সে সময় ইয়ারমুকের রণক্ষেত্রে শাম দেশের ভাগ্য পরীক্ষার শেষ অধ্যায় চলছিল।

এ যুদ্ধ চলাকালে কিছুসংখ্যক মুসলিম সৈন্য হযরত যুবাইরকে বলল, "আপনি যদি শত্রুর উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের কাছে পৌঁছে যান, তাহলে আমরা আপনার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করব।"

হযরত যুবইর (রা) বললেন, "তোমরা আমার সঙ্গে যেতে পারবে না।"

তারা যাবে না বলে ওয়াদা করল। অতঃপর হযরত যুবাইর (রা) এমন জোরদার আক্রমণ করেন যে, শত্রুপক্ষের ঠিক মধ্যস্থল ভেদ করে শত্রুদলের একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেন; কিন্তু অপর কেউ তাঁর সঙ্গে ঐ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। হযরত যুবাইর (রা) ফেরার সময় রোমকরা তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলে এবং চতুর্দিক হতে আক্রমণ করে তাঁকে যখম করে। ঘাড়ের উপর দুটি যখম অত্যন্ত গভীর এবং আশঙ্কাজনক ছিল। তা ভাল হওয়ার পরও গর্ত থেকে যায়। যুদ্ধে রোমক সৈন্য অন্তত সত্তর হাজার সৈন্য হারিয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়; আর মুসলমানগণ শাম দেশের অধিকারী হয়ে যান।

শাম বিজয়ের পর হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-কে নেতৃত্বে মিসর আক্রমণ করা হয়। তিনি ছোটখাট অনেক রাজ্য জয় করে ফেস্তাত অবরোধ করেন।

ফেস্তাত জয় করে মুসলমানগণ এস্কান্দারিয়ার দিকে রওয়ানা হন। দীর্ঘকাল ধরে তারা এস্কান্দারিয়ার কিল্লা অবরোধ করে রাখেন। কিন্তু সময় বেশি লাগছে দেখে খলিফাতুল মুসলেমীনের পক্ষ হতে যথাসম্ভব শীঘ্র মীমাংসার নির্দেশ পৌঁছল। অতঃপর হযরত আমর ইবনুল আস (রা) চরমভাবে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতএব, তিনি হযরত যুবাইর (রা) এবং হযরত মোসলেমা ইবনে মোখাল্লাদ (রা) বীরদ্বয়কে পরিচালক নিযুক্ত করে এমন জোরদার হামলা করেন যে, প্রথম হামলায়ই এস্কান্দারিয়া মুসলমানদের দখলে চলে আসে।

হিজরী তেইশ সনে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) জনৈক মজুসীর (অগ্নিপূজকের) অতর্কিত আক্রমণে আহত হয়। আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা) নিজের পরে খলিফা পদের জন্য ছয়জন বুযুর্গের নাম পেশ করেন। এ ছয় বুযুর্গের মধ্যে হযরত যুবাইর (রা)-ও ছিলেন।

তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর আমলে হযরত যুবাইর (রা) খুবই শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন করেন। কোন প্রকারের অভিযানে অংশগ্রহণ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে এ সময় তাঁর বয়সই সেই সমুদয় কাজে অংশগ্রহণ করার উপযোগী ছিল না। হিজরী পঁয়ত্রিশ সনে মিসরীয় বিদ্রোহীরা আমীরুল মোমেনীনের ঘর অবরোধ করলে হযরত যুবাইর (রা)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রা)-কে আমীরুল মোমেনীন হযরত ওসমান (রা)-এর হেফাযতের কাজে নিযুক্ত করা হয়।

আঠারই যিলহজ্জ রোজ শুক্রবার হযরত ওসমান (রা) বিদ্রোহীদের হাতে শহীদ হন। তৃতীয় খলিফার শাহাদতে সমগ্র মদীনায় বিদ্রোহীদের প্রভাব বিস্তার হয়। প্রত্যেকেই এ পরিস্থিতিতে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। হযরত ওসমান (রা)-এর সমর্থক এবং বনু উমাইয়ার অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিদ্রোহীরা যেহেতু আলী (রা)-এর সমর্থক ছিল, তাই তারা তাঁকে খেলাফতের ভার গ্রহণ করতে অনেকটা বাধ্যই করল বলা চলে।

হযরত আলী (রা) খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও মদিনায় শান্তি স্থাপন হল না। হযরত আলী (রা)-এর প্রচেষ্টা ছিল, বিদ্রোহীরা–বিশেষত মিসরীয় বিদ্রোহীরা স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্তন করুক এবং বেদুইনরা এ শহর হতে বের হয়ে যাক। কিন্তু শত প্রচেষ্টা চালানোর পরও তিনি স্বীয় উদ্দেশ্যে সফলকাম হতে পারলেন না।

চার মাস গত হয়ে গেল কিন্তু শান্তি স্থাপনের কোন উপায় বের হল না। অবশেষে নিরাশ হয়ে তিনি হযরত তালহা (রা)-এর সঙ্গে হযরত আলী (রা)-এর খেদমতে হাজির হয়ে শান্তি স্থাপন, লুটতরাজ বন্ধ এবং বিদ্রোহীদের শাস্তি দাবি জানান। হযরত আলী (রা) বলেন, "ভ্রাতঃ! আমি সমস্তই অবগত আছি। কিন্তু সেই সম্প্রদায়ের সাথে আমি কি করতে পারি, যাদের উপর আমার কোন অধিকার নেই; বরং তারাই আমার উপর রাজত্ব করছে।"

এরপর হযরত যুবাইর (রা) এবং হযরত তালহা (রা) সর্বপ্রথম উম্মুল মোমেনীনের খেদমতে হাজির হয়ে মদীনার বর্তমান পরিস্থিতি বর্ণনা করে বলেন, "আমরা বেদুইনদের ভয়ে মদীনা ছেড়ে এসেছি। আর আমরা মদীনায় এমন ভীত-সন্ত্রস্ত জাতিকে রেখে এসেছি, যারা ন্যায় বুঝে না, অন্যায় হতে নিজেকে রক্ষা করে না এবং আত্মরক্ষাও করতে পারে না।"

উম্মুল মোমেনীন তা শ্রবণ করে বললেন, "অবস্থা যদি তাই হয়, তাহলে সুষ্ঠুভাবে বিবেচনা করেই যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়ে বিদ্রোহ দমন করতেই হবে।" অতএব, এ মহতী কাজে কি উপায় অবলম্বন

করা যায়, তৎসম্পর্কে সামান্য কিছুটা আলোচনা-পর্যালোচনার পর সর্বসম্মমতিক্রমে বিদ্যমান পরিস্থিতির সংস্কার কাজে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। বনু উমাইয়ার অনেকেই মদীনা হতে পলায়ন করে এখানে সমবেত হয়েছিলেন। তারাও হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে যোগদান কররেন। তাদের এক হাজার সদস্যবিশিষ্ট একটি দল বসরার দিকে রওয়ানা হলেন। এ দলের উদ্দেশ্য ছিল বসরায় তাঁরা আরো কিছু শক্তি অর্জন করে মদীনার দিকে অগ্রসর হবেন।

এ দলটি বসরার নিকটবর্তী হলে বসরার গভর্ণর ওসমান ইবনে হানীফ তাঁদেরকে বাধা দান করেন। হানীফ বলেন, "হযরত যুবাইর (রা) এবং হযরত তালহা (রা) যখন হযরত আলী (রা)-এর হাতে বাইআত করেছেন, তখন বিদ্রোহ করার মত তাঁদের কি অধিকার আছে।" বুযুর্গদ্বয় বললেন, "সংস্কার কর্মসূচীর উপর কোন প্রকার বাধা-নিষেধ আরোপিত হতে পারে না।"

উভয়পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা সত্ত্বেও সমস্যা সমাধানে এমন কোন আশার আলো দেখা গেল না। পরিশেষে অবস্থা যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায় এবং হযরত আয়েশার সঙ্গীরা বসরা দখল করে নেন।

হযরত যুবাইর (রা) এবং হযরত তালহা (রা) চিঠিপত্রের মাধ্যমে কুফাবাসীদেরকেও বিদ্যমান বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সংস্কারকল্পে যোগদানের জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু হযরত হাসান ইবনে আলী (রা) পূর্বাহ্নেই কুফায় পৌঁছে জনসাধারণকে নিজের সমর্থক করে নেন। ফলে, অন্তত নয় হাজার সৈন্য যীকার নামক স্থানে হযরত আলীর সৈন্যদের সাথে এসে মিলিত হয়। এখান হতেই হযরত আলী (রা) এবং হযরত তালহা (রা)-ও পরিস্থিতি অবগত হয়ে স্বীয় সৈন্যদল প্রস্তুত করে অগ্রসর হন। উভয়পক্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উদ্ভূত সমস্যার যথার্থ সমাধানের পন্থা বের করার উদ্দেশ্যে আলোচনায় বসেও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। আলোচনা ব্যর্থ হয়। হিজরী ছত্রিশ সনের জমাদিউল উখরার দশ তারিখ উভয়পক্ষের সৈন্যদল মুখোমুখি হয়।

হযরত আলী (রা) একাকী ঘোড়ায় আরোহণ করে ময়দানের মধ্যস্থলে এসে হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)-কে ডেকে বলেন, হে আবু আবদুল্লাহ্! সেই দিনের কথা তোমার মনে আছে কি? যখন আমরা উভয়ে পরস্পরে হাতে হাত মিলিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখ দিয়ে গমন করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আলীকে বন্ধু মনে কর কি?"

তুমি উত্তর দিয়েছিলে, 'হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ্!' ভালমতে স্মরণ কর; তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "হে যুবাইর! তুমি একদিন আলীর বিরুদ্ধে না-হক যুদ্ধ করবে।"

হযরত যুবাইর (রা) উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, তিনি বলেছেন। যদিও তা আমি স্মরণ রেখেছিলাম না; কিন্তু এখন আমার স্মরণ হয়েছে।"

হযরত আলী (রা) মাত্র এ একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিজ দলে প্রত্যাবর্তন করেন। ঐদিকে হযরত যুবাইর (রা)-এর অন্তরে এক বিপ্লব সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যাবতীয় ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যুদ্ধ বন্ধের ব্যর্থ চেষ্টা করে একাকী বসরার দিকে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে ইবনে জরমুজ তাঁকে হত্যা করে।

মৃত্যুকালে হযরত যুবাইর (রা)-এর বয়স ছিল চৌষট্টি বছর। হিজরী ছয়ত্রিশ সনে তিনি শহীদ হন এবং ওয়াদিস সাবা'য় তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত যুবাইর (রা) যদিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী ছিলেন এবং তাঁর খেদমতে সর্বক্ষণ হাজির থাকতেন; কিন্তু খোদাভীতি ও পরহেযগারীর কারণে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস খুব কম রেওয়ায়ত করেন।

হযরত যুবাইর (রা) যেকোন মুসীবতের মোকাবিলা করতে মোটেই ভীত হতেন না। মৃত্যুর ভয়, তাঁকে কোন দুঃসাহসিক অভিযানে বাধা দিতে পারেনি। এস্কান্দারিয়া অবরোধের সময় যখন অবরোধ দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে লাগল, তখন তিনি সিঁড়ি লাগিয়ে কিল্লার ভেতরে ঢুকার জন্য উদ্যত হলেন। লোকেরা তাঁকে বাধা দিলেন, 'আমরা প্লেগের জন্যই আগমন করছি।' অর্থাৎ, মৃত্যুর ভয় আবার কি? এভাবে সিঁড়ি লাগিয়ে তিনি কিল্লার ভেতরে ঢুকে পড়েন।

হযরত যুবাইর (রা) দান-দক্ষিণা এবং আল্লাহ্র পথে খরচ করার কাজে সবার আগে থাকতেন। তাঁর কাছে এক হাজার গোলাম ছিল। তারা প্রত্যেক দিন শ্রম করে একটা মোটা অঙ্কের অর্থ উপার্জন করে তাঁকে দিত। কিন্তু তিনি কোন সময় সেই উপার্জিত অর্থ হতে নিজের বা নিজের পরিবারের জন্য একটি পাইও খরচ করতেন না; বরং সম্পূর্ণ অর্থ সঙ্গে সঙ্গেই দান করে দিতেন।

হযরত যুবাইর (রা)-এর জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় ছিল ব্যবসা। আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি ব্যবসায়ে কোন সময় ক্ষতিগ্রস্ত হননি।

ব্যবসা ব্যতীত মালে গনীমতেও তিনি অধিক পরিমাণে অংশ প্রাপ্ত হন। মৃত্যুকালে তাঁর পাঁচ কোটি দুই লক্ষ দেরহামের (অথবা দীনারের) স্থাবর সম্পত্তি ছিল। মদীনার পাশে তাঁর একটি বাগান ছিল। ঐ বাগানের বার্ষিক আয় কয়েক সহস্র দীনার ছিল।

ইসলামি সাম্যের প্রতি তাঁর খুবই লক্ষ্য থাকত। এমন কি, দুজন মুসলমানের লাশের মধ্যেও তিনি কোন প্রকারের পার্থক্য করতেন না। ওহোদের যুদ্ধে তাঁর মামা হযরত হামযা (রা) শহীদ হন। তখন হযরত সফিয়্যা (রা)

ভ্রাতার কাফনের জন্য দুখানা কাপড় এনে দিলেন। কিন্তু মামার লাশের পাশেই অপর একজন আনসারের লাশও ছিল। হযরত যুবাইর (রা)-এর বিবেক তা গ্রহণ করল না যে, একজনের জন্য দুখানা কাপড় এবং অপরজনের জন্য কোন কাপড়ই নেই। তাই তিনি দুখানা কাপড় উভয় লাশের মধ্যে সমান ভাগে বণ্টন করার নিমিত্তে মাপ দিয়ে দেখলেন। কিন্তু একখানা ছোট আর একখানা বড় ছিল। অবশেষে তিনি লটারীর মাধ্যমে উভয় লাশকে কাপড় দুখানা দ্বারা কাফন দিলেন, যাতে কোন লাশের প্রতি স্বজনপ্রীতির ভাব দেখা না যায়।

হযরত যুবাইর (রা) উচ্চমানের চারিত্রিক অলঙ্কারে পরিপূর্ণ ছিলেন। তাকওয়া-পরহেযগারী, হক-পছন্দী, বে-নিয়াযী, দান ইত্যাদি ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

হযরত আবদুর রহমান (রা)

রাসূল (সা)-এর নৈকট্যলাভকারী হিসেবে যিনি রাসূলের মহব্বতে খেদমত এবং হেফাযতে কোনমতেই পিছনে থাকতেন না। ওহুদ যুদ্ধের সাহাবাগণের আত্মবিসর্জন এবং জেহাদের অত্যন্ত কঠোর পরীক্ষা হয়। এ পরীক্ষায়ও যিনি সফলভাবে উত্তীর্ণ হন। তার সর্বাঙ্গে অন্তত বিশ বা ততোধিক যখম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পায়ে এমন আঘাত লেগেছিল যে, তিনি খোঁড়া হয়ে গিয়েছিলেন। তবুও রাসূলের মহব্বত এবং জেহাদের প্রেরণায় তিনি রক্ষক্ষেত্র হতে পলায়নের কল্পনাও করেন নি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন সময় বাইরের দিকে তশরীফ নিয়ে গেলে যিনি তাঁর পিছনে পিছনে গমন করতেন। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বাইরের দিকে তশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনিও তাঁর পশ্চাতে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি খেজুর বাগানে পৌঁছে আল্লাহ্র দরবারে সজদা করলেন। অনেকক্ষণ ধরে সেজদা হতে মস্ত মোবারক উত্তোলন করেছেন না দেখে তাঁর ভয় হল। তাই তিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেজদা হতে মস্তক উত্তোলন করে বললেন, "আবদুর রহমান, তোমার কি হয়েছে, তোমাকে এত ভীত ও আতঙ্কিত দেখাচ্ছে কেন?"

তিনি ভীত হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আরয করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি অনেকক্ষণ ধরে সেজদায় ছিলেন। মস্তক উত্তোলন করেছেন না দেখে আমার ভয় হল যে, খোদা না করুন আপনি আপনার প্রভুর সাথে মিলিত হয়েছেন।"

এ কথা শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরশাদ বললেন, "আমাকে হযরত জিবরীল (আঃ) বলেছেন যে, আমি কি আপনাকে সেই সুসংবাদ দান করব না, যা আল্লাহ্ পাক বলেছেন? আল্লাহ্ পাক বলেছেন–যেই ব্যক্তি আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি তার উপর রহমত বর্ষণ করব এবং আপনাকে সালাম পাঠাবে, আমি তার উপর শান্তি বর্ষণ করব। এ সুসংবাদের শুকরিয়া আদায় করতে গিয়ে আমি অনেকক্ষণ সেজদায় ছিলাম।"

নাম আবদুর রহমান। কুনিয়াত আবু মোহাম্মদ। পিতার নাম আওফ এবং মাতার নাম শেফা। পিতা-মাতা উভয়ই ছিলেন যোহরী গোত্রের। তাঁর বংশগত শাজরা এরূপ– আবদুর রহমান ইবনে আওফ, ইবনে আবদে আওফ, ইবনে আব্‌দ, ইবনুল হারেস, ইবনে যোহ্‌রা, ইবনে কেলাব, ইবনে মুররা আল্‌-কারশী আয্‌যোহরী।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল আবদে আমর। ইসলাম গ্রহণ করা পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাঁর নাম রাখেন আবদুর রহমান।

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্মের অন্তত দশ বছর পর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-এর জন্ম হয়। এ হিসেবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন ইসলাম প্রচার করেন, তখন হযরত আবদুর রহমান (রা)-এর বয়স ত্রিশ বছরেরও কিছু ঊর্ধ্বে ছিল। জন্মগত নির্মল স্বভাবের অধিকারী এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হওয়ায় ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই তিনি মদ্যপান ছেড়ে দিয়েছেন। হযরত আবুবকর (রা)-এর মারফতে তিনি সৎ পথের সন্ধান লাভ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খেদমতে হাজির হয়ে মুসলমানদের দলভুক্ত হন।

ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-ও সর্বসাধারণ মুসলমানদের ন্যায় মুশরিকীনের জোর-যুলুম-নির্যাতন ইত্যাদি হতে রেহাই পাননি, এমন কি, দেশান্তর হতেও বাধ্য হন। প্রথমে তিনি হাবশা গমন করেন, পরে সেখান হতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে সকলের সাথে মদীনায় হিজরত করেন।

হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হযরত সা'দ ইবনুর রবী (রা)-এর সাথে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-এর ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন। হযরত সা'দ আনসারী (রা) যেমন ধনী ছিল, তেমনি দানবীরও ছিল। তিনি সম্পদ দান করতে চাইলে আবদুর রহমান তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ব্যবসা করেন।

হিজরী দ্বিতীয় সন হতে কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ জেহাদে অবতীর্ণ হন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) অধিকাংশ জেহাদে অংশগ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত সাহসিকতা ও অবিচলতার পরিচয় দান করেন।

ওহুদ যুদ্ধে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধের পর দেখা গেছে, তাঁর শরীরে কুড়িটি যখমের চিহ্ন ছিল। আবার কারো মতে কুড়ির ঊর্ধ্বে ছিল। বিশেষত পায়ের যখম মারাত্মক ছিল। এমন কি সুস্থ হওয়ার পরও তিনি রীতিমত চলাফেরা করতে পারতেন না। তাঁকে খোঁড়িয়ে চলতে হত।

হিজরী ছয় সনের শা'বান মাসে হযরত আবদুর রহমান (রা) দুমাতুল জনদল অভিযানে প্রেরিত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ডেকে স্বীয় হস্ত মোবারক দ্বারা তাঁর মাথায় পাগড়ি বেঁধে দিলেন, মাথার পিছনে পাগড়ির শেমলা ঝুলালেন এবং ইসলামি পতাকা তাঁর হস্তে অর্পণ করে বললেন, "বিসমিল্লাহ্! রাস্তায় রওয়ানা হও। যারা আল্লাহর নাফরমানী করে, তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর। কিন্তু কাউকে ধোঁকা দিও না, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে মারবে না। এমন কি, দুমাতুল জনদল পৌঁছে কলব গোত্রের লোকজনকেই প্রথমে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিবে। তারা যদি খুশি মনে তোমার দাওয়াত গ্রহণ করে, তাহলে তাদের রাজকন্যাকে বিবাহ করবে। অন্যথায় যুদ্ধ করবে।"

হযরত আবদুর রহমান (রা) সম্মান ও মর্যাদা সহকারে মদীনা হতে রওয়ানা হয়ে দুমাতুল জনদল পৌঁছেন এবং তিনদিন ধরে এরূপ সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে ইসলামি তবলীগ করেন যে, কলব গোত্রের সরদার আসবাগ ইবনে আমর আল্-কলবী তাঁর বিপুলসংখ্যাক জাত-ভাইসহ সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করেন। অবশ্য যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, তারা জিযিয়া দেওয়ার অঙ্গীকার করে।

মক্কা বিজয় হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিদায় হজ্জ পর্যন্ত ছোট বড় যত যুদ্ধই সংঘটিত হয়েছে, হযরত আবদুর রহমান (রা) তার প্রত্যেকটিতেই সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বিদায় হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তনের পর হিজরী একাদশ সনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইন্তেকাল করেন। অতঃপর খলিফা নির্বাচন প্রশ্নে উপস্থিত কিছু সমস্যা দেখা দিল। হযরত আবদুর রহমান (রা) এ সমস্যার সমাধানে অংশগ্রহণ করেন।

প্রথম খলিফা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর আমলে হযরত আবদুর রহমান নিঃস্বার্থ পরামর্শদাতা এবং সঠিক রায়দানকারী হিসেবে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। হিজরী তের সনে হযরত আবুবকর (রা) মৃত্যুশয্যায় থেকে নিজের একজন স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির জন্য চিন্তা করছিলেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফকে ডেকে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন এবং এ গুরুদায়িত্বের জন্য হযরত ওমর (রা)-এর নাম পেশ করলেন। হযরত আবুবকর (রা) বলেন, 'আমি এ পদের জন্য ওমরের নাম পেশ করছি। এতে তোমার মতামত কি?'

হযরত আবদুর রহমান (রা) নির্বিঘ্নে উত্তর দিলেন, "হযরত ওমর (রা)-এর যোগ্যতা সম্পর্কে কারও দ্বিমত নেই। কিন্তু তিনি যে বড় কঠোর মেযাজসম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁর প্রকৃতিতে রাগের ভাগ বেশি! সুতরাং এত রাগ নিয়ে তিনি কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন?" হযরত আবুবকর (রা) বলেন, "তিনি এ জন্যই কঠোর ছিলেন যে, আমি অত্যধিক নম্র ছিলাম। কিন্তু এ গুরুদায়িত্ব তাঁর উপর চাপিয়ে দিলে তিনি নিজেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবেন।"

অতঃপর কয়েকদিন অসুস্থ থাকার পর আবুবকর (রা) ইন্তেকাল করেন এবং হযরত ওমর (রা) খলিফাতুল মুসলেমীন নিযুক্ত হন।

হযরত ওমর (রা) খলিফাতুল মুসলেমীন নিযুক্ত হওয়ার পর রাষ্ট্র পরিচালনায় শৃঙ্খলা ঠিক রাখার জন্য নতুনভাবে একটি বলিষ্ঠ পরিষদ গঠন করেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এ পরিষদের একজন সদস্য মনোনীত হন এবং অত্যন্ত দক্ষ বলে প্রমাণিত হন।

ইরাক আক্রমণের জন্য মদীনার চতুদিকে ফৌজ জমা হয় এবং জনসাধারণ দাবি জানাচ্ছিল যে, এ ফৌজের সেনাপতির দায়িত্ব স্বয়ং আমীরুল মোমেনীন গ্রহণ করুন। জনসাধারণের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ওমর (রা) এ গুরুদায়িত্বের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু একমাত্র হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) তার বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, "যুদ্ধে জয় এবং পরাজয় এ দুইটি দিকই সমান। কেউ বলতে পারে না, কে জয়ী হবে। খোদা না করুন, যদি এ যুদ্ধে পরাজয়বরণ করতে হয় এবং আমীরুল মোমেনীন শহীদ হয়ে যান, তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে, ঐখানেই ইসলামের সমাপ্তি ঘটবে।"

হযরত আবদুর রহমানের এ দূরদর্শিতা বড় বড় সাহাবীগণের চক্ষু খুলে দেওয়ার জন্যও যথেষ্ট ছিল। অতঃপর তাঁরা সকলেই একবাক্যে হযরত আবদুর রহমান (রা)-এর সমর্থন করলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য কে প্রস্তুত হবে? হযরত আলী (রা)-এর কাছে অনুরোধ করা হলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এভাবে সকলেই চিন্তা করেছিলেন। এমন সময় হযরত আবদুর রহমান (রা) এ কাজের জন্যও একজন উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনীত করেন এবং দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, "আমি একজন যোগ্য ব্যক্তি ঠিক করেছি।" হযরত ওমর (রা) জিজ্ঞেস করেন, "কে সেই ব্যক্তিটি?" উত্তর দিলেন, "তিনি হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)।" হযরত আবদুর রহমানের এ নিখুঁত নির্বাচনের জন্য চতুদিক হতে তাঁর প্রতি মারহাবা, মাবাহাবা আর মোবারকবাদ আসতে লাগল। অতএব, পরবর্তীকালের ঘটনাবলী দ্বারাই এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, হযরত আবদুর রহমান (রা)-এর নির্বাচন যে কত নিখুঁত ছিল।

হযরত ওমর (রা) ফজরের নামায পড়ার সময় যখন ফীরোয নামক জনৈক অগ্নিপূজক ক্রীতদাস কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন, তখন তিনি ইমামতের জন্য হযরত আবদুর রহমান (রা)-কে পেশ মোসাল্লায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে হযরত ওমর (রা)-কে তুলে ঘরে নিয়ে আসেন।

অবস্থা শোচনীয় দেখে জনগণ খলিফার কাছে নিজের একজন স্থলাভিষিক্তের নাম বলার জন্য অনুরোধ করলেন। তখন হযরত ওমর (রা) ছয় জন বুযুর্গের

নাম উল্লেখ করে বলেন, "আপনারা এ ছয়জনের মধ্য হতে যেকোন একজনকে খলিফা নির্বাচন করতে পারেন। কারণ, এ ছয়জন এমন ব্যক্তি, যঁদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত ভাল ধারণা পোষণ করেছেন।"

হযরত ওমর (রা)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর দাফন কাজ শেষান্তে তাঁরই অসিয়ত মোতাবেক খলিফা নির্বাচনের প্রশ্ন উঠে। দুদিন ধরে বহু আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে; কিন্তু শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি। এ অবস্থায় তৃতীয়দিন হযরত আবদুর রহমান (রা) বলেন, "প্রশ্নটা ছয়জনের মধ্যেই সীমিত। যে তিনজন সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কারো সমর্থন পাওয়া যায়নি, তাঁদেরকে আমরা বাদ দিয়ে অপর তিনজন সম্পর্কে আলোচনা করি। এতে মতদ্বৈধতা বহুলাংশে কমে যাবে।" এ প্রস্তাব সকলেরই মনঃপূত হয়। অতএব, হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) হযরত আলী (রা) এর নাম প্রস্তাব করলেন, হযরত তালহা (রা) হযরত ওসমান (রা)-এর নাম প্রস্তাব করলেন।

এরপর হযরত আবদুর রহমান (রা) বলেন, "এখন দেখছি যে, আমাদের এ তিনজনের মধ্যেই যেকোন একজন খলিফা নির্বচিত হবেন। আমি এ কাজটা আরো সহজে সম্পন্ন হওয়ার পথ সুগম করছি। আমি নিজে খলিফা পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব না। এরপর হযরত ওসমান (রা)-কে খলিফা নির্বাচিত করা হয়।

হযরত ওসমান (রা)-এর আমলে হযরত আবদুর রহমান (রা) অত্যন্ত নীরব জীবন-যাপন করেন। রাষ্ট্র পরিচালনার কোন কাজে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। অতঃপর হিজরী বত্রিশ সনে পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

তাঁর জানাযার নিকট দাঁড়িয়ে হযরত আলী (রা) বলেন, "হে আবদুর রহমান ইবনে আওফ! তুমি আল্লাহ্র কাছে যাচ্ছ। তুমি দুনিয়ার পরিষ্কার পানি পেয়েছ এবং ঘোলা আর দূষিত পানি ছেড়ে গিয়েছ।" হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) জানাযা উত্তোলনকারীদের মধ্যে শামিল ছিলেন। তিনি বলেন, ওয়া জাবালাহ্! অর্থাৎ এ পর্বতটিও আজ আমাদেরকে ছেড়ে চলল। আমীরুল মোমেনীন হযরত ওসমান (রা) জানাযার নামায পড়ান এবং মদীনার জান্নতুল বাকী নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতের ফলে হযরত আবদুল রহমান ইবনে আওফের এলমের ঝুলি মুক্তায় পরিপূর্ণ ছিল। যদিও তিনি অপরাপর বড় বড় সাহাবাগণের ন্যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস খুব কম রেওয়ায়েত করেছেন, তবুও খোলাফায়ে রাশেদীনকে নিজ জ্ঞানে উপকৃত করেছেন।

হিজরী আঠার সনে আমওয়াস নামক স্থানে প্লেগে রোগ দেখা দিল। হযরত ওমর (রা) সাহাবীগণকে ডেকে পরামর্শ চাইলেন যে, "প্লেগ কবলিত এলাকা হতে অন্যত্র চলে যাওয়া জায়েয আছে কিনা?" প্রশ্নের কেউ কোন সঠিক উত্তর দিতে পারলেন না। তখন হযরত আবদুর রহমান (রা) তথায় উপস্থিত ছিলেন না। পরে যখন তিনি সংবাদ পেলেন, তখন তিনি হাজির হয়ে আরয করলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে শুনেছি যে, প্লেগ কবলিত এলাকায় যাইও না। আর যদি প্রথম হতেই সেই এলাকায় থাক, তাহলে সেখান হতে পলায়নও করিও না।"

আল্লাহ্ পাক হযরত আবদুর রহমানকে সঠিক মতামত প্রকাশ এবং দূরদর্শিতার যেই নেয়ামত প্রদান করেছেন, খুব সমসংখ্যক লোকই তাঁর সমতুল্য হয়েছে। হযরত ওমর (রা) শেষ সময়ে পরবর্তী খলিফা পদের জন্য যেই ছয়জন বুযুর্গের নাম উল্লেখ করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেকের প্রশংসাও করেছিলেন। তিনি হযরত আবদুর রহমান (রা) সম্পর্কে বলেছিলেন, "আবদুর রহমানের মতামত উন্নত মনের, তিনি বিচক্ষণ, বুদ্ধিসম্পন্ন এবং অত্যন্ত ভদ্র। তাঁর মতামত অগ্রাহ্য করিও না। নির্বাচনে মতানৈক্য ঘটলে আবদুর রহমান যার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন, তার পক্ষেই থাকিও।"

হযরত আবুদর রহমান ইবনে আওফ (রা)-এর আপাদমস্তক ফযল ও কামাল এবং উন্নত মানের চরিত্রে পরিপূর্ণ ছিল। বিশেষত খোদাভীতি, রাসূলের মহব্বত, সততা, দয়া, উদারতা এবং দান তাঁর অত্যন্ত উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য ছিল। এতদ্ব্যতীত বীরত্ব, দূরদর্শিতা এবং বিবাদ মীমাংসা তাঁর অদ্বিতীয় গুণ ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবদুর রহমান (রা) সর্বদা তাঁর কথাই স্মরণ করতেন এবং কথায় কথায় তাঁর কোন হাদীস বর্ণনা করতেন। হযরত নওফল ইবনে আয়াস (রা) বলেন, 'হযরত আবদুর রহমান (রা)-এর সঙ্গ অত্যন্ত আমোদপূর্ণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন ভাল বন্ধু ছিলেন।

হযরত আবদুল রহমান (রা) পরের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজে ব্যবসা করাকেই পছন্দ করেছিলেন। এ ব্যবসায় তিনি আর্থিক দিক দিয়ে এত উন্নতি করেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত একজন বিরাট ধনী হয়েছিলেন। এমন কি, একদা তাঁর কর্মচারীর দল মৌসুম শেষে যখন মদীনা পৌঁছে, তখন সাত শত উটের পিঠে কেবল গম, আটা এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী বোঝাই ছিল। এ আযীমুশ্শান দলটি মদীনা পৌঁছলে সমগ্র মদীনায় একটা রব উঠল। হযরত আয়েশা (রা) যখন এ সংবাদ শ্রবণ করলেন, তখন বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে শ্রবণ করেছি, আবদুর রহমান পিপীলিকার চালে চলে (হামাগুড়ি দিয়ে) বেহেশ্তে গমন করবেন।"

হযরত আবদুর রহমান (রা) এ কথা শ্রবণ করে অনতিবিলম্বে হযরত আয়েশা (রা)-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন, "আমি আপনাকে সাক্ষী করছি যে, এ ব্যবসায়ের সব মাল আসবাব লাভে-আসলে এমন কি সমস্ত উট এবং তার আনুষঙ্গিক যাবতীয় কিছু আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করে দিলাম।"

প্রকৃতপক্ষে সাহাবাগণের ধন-দৌলত তাঁদের ব্যক্তিগত আয়েশ-আরামের জন্য ছিল না; বরং আর্থিক দিক দিয়ে যে যেই পরিমাণ অর্থশালী হয়েছিল, সেই অনুপাতে তাঁদের দান-দক্ষিণাও বৃদ্ধি পেয়েছে। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-এর দান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমল হতেই আরম্ভ হয়েছে। তখন হতেই তিনি সময়ে অসময়ে মোটা অংকের অর্থ দান করেন। দান-খয়রাত করার জন্য উৎসাহ দান করে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হলে হযরত আবদুর রহমান (রা) তাঁর সম্পূর্ণ মালের অর্ধাংশ অর্থাৎ, চার হাজার রৌপামুদ্রা পেশ করেন। অতঃপর তিনি পরপর দুবার এবং প্রতিবারে চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করেন।

হযরত আবদুর রহমান (রা)-এর দান এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাঁর খরচ করার এ অভ্যাস জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। মৃত্যুকালেও তিনি পঞ্চাশ হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) এবং একহাজার ঘোড়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করেন।

তিনি মৃত্যুকালে উম্মাহাতুল মোমেনীনের জন্যও একটি বাগানের অসিয়ত করে যান। এ বাগান চার লক্ষ দেরহাম (রৌপমুদ্রা) মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

হযরত সা'দ (রা)

হিজরী তৃতীয় সনে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তীরন্দাজগণের সামান্য অবহেলায় মুসলমানদের জয় শেষ পর্যন্ত পরাজয়ে পরিণত হয় এবং অতর্কিত আক্রমণে অধিকাংশ মুজাহেদীন বিচলিত হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি ঐ বীরদের মধ্যেই শামিল ছিলেন, যাঁরা বিচলিত হওয়া জানতেন না। তিনি তীর চালনায় নিপুণ ছিলেন। তাই তিনি তীর দ্বারা কাফেরদের উপর জোরদার আক্রমণ চালান। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে তীর এগিয়ে দিতেন।

যুদ্ধের সময় জনৈক মুশরিক মুসলমানদের উপর বীরবিক্রমে আক্রমণ করেছিল এবং তাঁর আক্রমণে সমস্ত মুসলমান হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। তাকে নিশানা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে নির্দেশ দান করলেন। দুর্ভাগ্যবশত তখন তীর শেষ হয়ে গিয়েছিল। মাত্র একটা অকেজো তীর ছিল, যার মাথায় ফলক ছিল না, অবশ্য সুচালো ছিল। তিনি নির্দেশ পালনার্থে সেই অকেজো তীর নিয়া উক্ত মুশরিকের কপাল নিশানা করে এমন সুন্দরভাবে ছুঁড়লেন যে, তীর যথাস্থানে লাগল এবং সে অত্যন্ত দিশাহারা হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই উলঙ্গ অবস্থায় নীচে পড়ে গেল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ বিপদের সময়ও হেসে ফেললেন।

তাঁর নাম সা'দ। আবু ইসহাক কুনিয়াত। পিতার নাম মালেক। কুনিয়াত আবু ওয়াক্কাস এবং মাতার নাম হামনা। বংশগত শাজরা নিম্নরূপ– সা'দ ইবনে মালেক, ইবনে ওয়াহব, ইবনে আবদে মোনাফ, ইবনে যোহ্‌রা, ইবনে মুররা, ইবনে কা'ব, ইবনে লুওয়াই, ইবনে গালেব, ইবনে ফেহ্‌র, ইবনে নযর, ইবনে কেনানা আল-কারশী আয-যোহরী। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আত্মীয়তার দিক দিয়ে ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মামা। স্বয়ং রাসূলূল্লাহ (সা) একাধিকবার একথা স্বীকার করেছেন যে, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস আত্মীয়তার দিক দিয়ে আমার মামা হন।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) যখন সতর বছর বয়সের যুবক ছিলেন, তখনই তাঁর অন্তরে ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা জাগ্রত হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর উসীলায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরত পর্যন্ত মক্কাতেই ছিলেন। যদিও তথায় তিনি অপরাপর মুসলমানদের ন্যায় মুশরিকদের যুলুম-অত্যাচারের কবলে পতিত থাকেন; কিন্তু তাঁর অবিচলতা তাঁকে অন্যত্র গমন করার অনুমতি দেয়নি। অবশ্য আত্মরক্ষার খাতিরে সাধারণত মক্কার অনাবাদ এলাকায় গিয়ে তিনি আল্লাহ্র এবাদত করতেন। এ সমস্ত এলাকায় অপরাপর সাহাবীগণও আগমন করে আশ্রয় নিতেন এবং নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ্র এবাদত করতেন।

একদা এমনই এক নির্জন এলাকায় আরো কয়েকজন সাহাবীসহ হযরত সা'দ (রা) আল্লাহ্র এবাদতে মশগুল ছিলেন। এমন সময় মুশরিকীনের একদল সেদিক দিয়ে গমনকালে তাঁদেরকে দেখে ইসলামের প্রতি বিদ্রুপ করতে লাগল। কাফেরদের মুখে ইসলামের বিদ্রুপ শ্রবণ করে এ সংকট মুহূর্তেও হযরত সা'দ (রা) তাঁর উত্তেজনা দমিয়ে রাখতে পারলেন না এবং উটের এক মোটা হাড় উঠিয়ে সজোরে আঘাত হানলেন। ফলে জনৈক মুশরিকের মাথা ফেটে গেল এবং রক্তস্রোত বইতে লাগল। বলাবাহুল্য, ইসলামের খাতিরে এটাই সর্বপ্রথম রক্তপাত, যা হযরত সা'দ (রা)-এর হাতে ঘটেছিল।

মুশরিকদের অত্যাচারে মক্কায় মুসলমানদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদেরকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দান করেন। এ নির্দেশ মোতাবেক হযরত সা'দ (রা) মদীনার দিকে গমন করেন। মদীনায় তাঁর একজন ভ্রাতা ছিল। তিনি মদীনায় পৌঁছে স্বীয় ভ্রাতার ঘরেই মেহমান হলেন।

বদর যুদ্ধ হতে যুদ্ধের ধারা আরম্ভ হয়। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) এ যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দান করেন। তিনি সাঈদ ইবনুল আস নামক মুশরিকদের জনৈক বীর সরদারকে কতল করেন। সাঈদ ইবনুল আসের যুলকোতাইফা নামক একখানা তরবারি ছিল। তরবারিখানা হযরত সা'দ (রা)-এর বড় পছন্দ হল! যুদ্ধে জয়লাভের পর হযরত সা'দ (রা) উক্ত তরবারি হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাজির হন এবং নিজে তা গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত যেহেতু গনীমতের মাল সম্পর্কে কোন রকম আদেশ-নির্দেশ নাজিল হয়নি, তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরশাদ করলেন, "যেখান হতে নিয়েছ, ঐখানেই রেখে দাও।"

কিছুক্ষণ পরেই সূরা আনফাল নাযিল হয় এবং তাতে গনীমতের মাল সম্পর্কীয় নির্দেশ দান করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সা'দকে ডেকে যুলকোতাইফা তরবারিখানা প্রদান করেন।

ওহোদের যুদ্ধ হতে মক্কা বিজয় পর্যন্ত যে সমস্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, হযরত সা'দ (রা) প্রত্যেক যুদ্ধেই অসীম সাহসিকতার সাথে অংশগ্রহণ করেন।

মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের যুদ্ধেও তিনি ওহোদের যুদ্ধের মত বীরত্ব এবং অবিচলতার পরিচয় দান করেন।

তায়েফ এবং তবুকের যুদ্ধেও তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। হিজরী দশম সনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাজ্জাতুল বেদার জন্য গমন করেন। হযরত সা'দ তখনো সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু মক্কা পৌঁছে রোগাক্রান্ত হন। এমন কি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে দেখার জন্য তশরীফ আনয়ন করলে তিনি জীবন হতে নিরাশ হয়ে আরয করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি অর্থশালী মানুষ। কিন্তু একজন মাত্র আমার মেয়ে আছে। সে-ই আমার একমাত্র ওয়ারিস! তাই আপনি যদি অনুমতি দান করেন, তাহলে আমি আমার সমুদয় মালের দুই-তৃতীয়াংশ আল্লাহর রাস্তায় দান করে যাই।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করলেন। অতঃপর তিনি আরয করলেন, "দুই-তৃতীয়াংশ না হলে অর্ধেকের অনুমতি দান করুন।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবারও নিষেধ করে বললেন, "অবশ্য এক-তৃতীয়াংশ দান করতে পর। তবে তাও বেশি হয়ে যায়। তুমি স্বীয় ওয়ারিসের জন্য এ পরিমাণ মাল রেখে যাও, যাতে তোমার পরে তারা পরের মুখাপেক্ষী না হয়। তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টিলাভের জন্য যা কিছু করবে তার বদলা পাবে। এমন কি, নিজের স্ত্রীর মুখে এক লোকমা ভাত দিলে তাতেও সওয়াব হবে।"

হযরত সা'দ (রা)-এর অন্তরে মদীনার প্রতি এতই ভক্তি জন্মেছিল যে, মক্কায় মরণও তিনি পছন্দ করেছিলেন না। একবার তিনি মারাত্মক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। রোগ যতই বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাঁর দুশ্চিন্তা ততই বেড়ে যাচ্ছিল। রোগকাতর অবস্থায় তিনি ক্রন্দন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ক্রন্দন করতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি আরয করলেন, "মাতৃভূমিকে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের মহব্বতের খাতিরে ত্যাগ করেছিলাম, সেই মাতৃভূমির মাটিই আমার ভাগ্যে আছে বলে আশংকা করছি। অথচ আমি মদীনায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আশা রাখি।"

তা শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সান্ত্বনা দান করলেন এবং তাঁর বুকে হাত মোবারক রেখে আল্লাহ্র কাছে তিনবার দোয়া করলেন, "ইয়া আল্লাহ্! সা'দকে রোগমুক্ত করুন, ইয়া আল্লাহ্! সা'দকে রোগমুক্ত করুন; ইয়া আল্লাহ্! সা'দকে রোগমুক্ত করুন।"

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দোয়া হযরত সা'দ (রা)-এর জন্য অমৃততুল্য প্রমাণিত হল। হযরত সা'দ (রা) আরোগ্য লাভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে এ সুসংবাদও জানালেন যে, "হে সা'দ! তুমি ঠিক ততদিন পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হবে না, যতদিন না তোমার হাতে একটি জাতির উপকার এবং আরেকটি জাতির ক্ষতি সাধন না হয়।"

হযরত সা'দ (আঃ)-এর বিজয়াভিযানেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর দ্বারা আরব জাতি উপকৃত এবং ভিন্ন জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মক্কা হতে মদীনা প্রত্যাবর্তন করার পরের বছরই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইন্তেকাল করেন। তারপর হযরত আবুবকর (রা) খলিফা মনোনীত হন। হযরত সা'দ (রা) বিনাদ্বিধায় সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) আবুবকর (রা)-এর শাসন আমল হতে হাওয়াযেনের গভর্ণর ছিলেন। সেখান হতে তিনি ইরানের যুদ্ধে একহাজার যুবক প্রেরণ করেন। তাদের প্রত্যেকেই তীর এবং তলোয়ার পরিচালনায় সুনিপুণ ছিল। এভাবে আশাতীত পরিমাণে সৈন্য সংগ্রহ হল। কিন্তু প্রশ্ন হল এই যে, এ অসংখ্য ফৌজের সেনাপতির ভার গ্রহণ করবে কে? কোন উপযুক্ত ব্যক্তি দেখা যাচ্ছিল না। হযরত আলী (রা)-এর খেদমতে অনুরোধ করা হলে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেন। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) এ বিপুলসংখ্যক ফৌজের সেনাপতি নির্বাচিত হলেন।

এভাবে হযরত সা'দ (রা)-এর জীবনের প্রথম অধ্যায়ের সূচনা হল, যা সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল এবং যা তাঁকে পৃথিবীর ইতিহাসের বড় বড় বীর-সেনানীদের পর্যায়ে দাঁড় করিয়ে দিল।

তিনি সসৈন্যে গন্তব্যস্থলের দিকে রওয়ানা হয়ে সা'লাবিয়া নামক স্থানে গিয়ে উপনীত হন। তথায় তিন মাস পর্যন্ত অবস্থান করে সেখান হতে মিশরাফ নামক স্থানে গিয়ে উপনীত হন। এদিকে মোসান্না শাইবানী যীকার নামক স্থানে আট হাজার সৈন্যসহ হযরত সা'দ (রা)-এর আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন। কিন্তু হযরত সা'দ (রা)-এর পৌঁছার পূর্বেই মোসান্না শাইবানী ইন্তেকাল করেন এবং তিনি নিজের ভ্রাতাকে সেনাপতি হযরত সা'দ (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার নির্দেশ দান করেন। তাঁর ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নির্দেশ অনুসারে মিশরাফে এসে হযরত সা'দ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং মোসান্না যা কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর নিকট বর্ণনা করেন।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) মিশরাফ অবস্থানকালে সৈন্যদের নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখেন। সৈন্য সংখ্যা ত্রিশ হাজার ছিল। তাদের মধ্যে ডানে, বামে, মধ্যস্থলে এবং পশ্চাদ্ভাগের জন্য সৈন্য ভাগ করে পৃথক পৃথক কমাণ্ডার নিযুক্ত করেন। তারপর বর্তমান পরিস্থিতি, রণক্ষেত্রের মানচিত্র, যুদ্ধের ঘাঁটি এবং রসদের অবস্থা ইত্যাদি যাবতীয় খবর খলিফাতুল মুসলেমীনের খেদমতে প্রেরণ করলেন। খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রা) নির্দেশ দান করলেন যে, মিশরাফ হতে অগ্রসর হয়ে কাদেসিয়া পৌঁছে এভাবে ঘাঁটি স্থাপন

কর, যাতে আরবের পর্বতমালা থাকে পিছনে এবং সম্মুখে থাকে শত্রুর দেশ। অতএব, হযরত সা'দ (রা) খলিফাতুল মুসলেমীনের নির্দেশ মোতাবেক মিশরাফ হতে রওয়ানা হয়ে কাদেসিয়া উপনীত হন এবং ঘাটি স্থাপন করেন।

হযরত সা'দ (রা) যুদ্ধ আরম্ভ করার পূর্বে সরদারদের মধ্য হতে চৌদ্দজন লোক নির্বাচন করে দূত হিসেবে তাঁদেরকে মাদায়েন প্রেরণ করেন। তাঁদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, আপনারা আগে শাহে ইরানকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিবেন। তিনি যদি সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহলে আর যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না। অন্যথায় জিযিয়া কর দিতে বলবেন। আর যদি এ প্রস্তাবও গ্রহণ না করেন, তাহলে যুদ্ধ অনিবার্য।

চৌদ্দ সদস্যবিশিষ্ট দূতদল শাহে ইরানের দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে ইসলাম গ্রহণে আসম্মতি জানালে জিযিয়া কর দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করা হল। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে বহু তর্ক-বিতর্ক চলে। ইরানীরা কোন একটি প্রস্তাবই গ্রহণ করতে সম্মত নয় দেখে অবশেষে দূতগণ বললেন, "তোমরা যখন আমাদের কোন একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করলে না। তখন আমরা আমাদের নবী মোহাম্মদ (সা)-এর ভবিষৎদ্বাণী শুনাচ্ছি তিনি বলেছেন, একদিন তোমরাদের এ মাতৃভূমি আমাদের অধিকারে আসবেই।"

মুসলমানদের এ স্পষ্ট কথায় শাহে ইরান ক্রোধে আগুন হয়ে কিছু পরিমাণ ধুলা-মাটি এনে বললেন, "এই নাও এটাই তোমাদের অধিকারে যেতে পার এবং এটিই তোমরা পাবে।" হযরত আসেম ইবনে ওমর (রা) এ ধূলা-বালি মিশ্রিত মাটি সযত্নে স্বীয় চাদরে নিয়ে সোজা হযরত সা'দ (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তা তাঁর সম্মুখে রেখে বললেন, "বিজয় মোবারক হোক! শত্রুর নিজেরাই নিজেদের ভূমি আমাদেরকে প্রদান করেছে।" এভাবে দূতগণ শাহে ইরানের নিকট হতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেল। ইরানী সেনাপতি রুস্তমও সাবাত হতে সৈন্যসহ আগমন করে কাদেসিয়ায় ঘাঁটি স্থাপন করল।

অবশেষে যুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধে মুসলমানদের অবিচলতা এবং দৃঢ়তা ইরানীদেরকে সাহসহারা করে দিল। ফলে তারা পলায়ন করতে বাধ্য হল। ইরানী সেনাপতি রুস্তমও পলায়নে বাধ্য হল, কিন্তু হেলাল নামক জনৈক মুসলিম সিপাহী দৌড়িয়ে গিয়ে রুস্তমকে হত্যা করল।

কাদেসিয়া জয় করে হযরত সা'দ (রা) আরব সীমান্ত সংলগ্ন ইরাক দখল করার সংকল্প নিলেন। ইরানীরা বাবেলে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছিল, তাই প্রথমে সেদিকে অগ্রসর হলেন। তিনি ইরানীদেরকে এমনই ভীত করে দিয়েছেন যে,

ইরানী সর্দাররা তাঁর সাথে সন্ধি করে নিল এবং মুসলমানদের নদী পার হওয়ার জন্য স্থানে স্থানে সেতু তৈরি করে দিল। এভাবে অতি অনায়াসেই হযরত সা'দ (রা) সসৈন্যে বাবেলে উপনীত হন। অবিলম্বে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে আক্রমণ চালালেন এবং প্রথম আক্রমণেই বাবেল দখল করে নিলেন। তারপর তিনি বাবেল অবস্থান করলেন এবং যাহ্‌রা নামক জনৈক কমাণ্ডারের অধীনে কিছু সৈন্য দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। যাহ্‌রা কুসী নামক স্থানে গিয়ে উপনীত হন এবং সেখানকার সর্দার শহরে ইয়ারকে নিহত করে কূসী দখন করে নেন।

ইতিহাস বিখ্যাত স্থান কূসী, সেখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে নমরূদ বন্দী করেছিল। সেই বন্দিশালা তখন পর্যন্ত রক্ষিত ছিল। কূসী বিজয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে হযরত সা'দ (রা) তথায় গমন করেন এবং উক্ত বন্দিশালা পরিদর্শন করেন। এরপর মাদায়েন বিজয়ের মধ্য দিয়েই সমগ্র ইরাকের উপর মুসলমানদের এক প্রকার দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। বড় বড় রঈস আর জমিদাররা দ্বিরুক্তি না করে অস্ত্র সংবরণ করল এবং সন্ধি করে নিল। অতঃপর সমগ্র দেশে শান্তি স্থাপনের ঘোষণা করা হল। এ ঘোষণার পর যারা ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, পুনরায় এসে নিজ নিজ ঘরে বাস করতে লাগল। অল্পদিনের মধ্যে বিজয়ী এবং বিজিতদের মধ্যে গভীর সখ্যতায় ভাব জন্ম নিল।

ইরাক বিজয়ের পর হযরত সা'দ (রা) জালুলা এবং তিকরীতে সৈন্য প্রেরণ করলেন এবং সেখানেও ইসলামি পতাকা উত্তোলন করা হয়। তারপর হযরত সা'দ (রা) আমীরুল মোমেনীন-এর কাছে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি চাইলেন। আমীরুল মোমেনীন উত্তর দিলেন, "দেশ বিজয়ের চাইতে বরং এক একজন সিপাহীর রক্তই আমার কাছে বেশি প্রিয়। কিন্তু কি করি; আমাদের এবং আজমী (অনারব)-দের মধ্যে যদি সেকান্দরী দেয়াল থাকত, তাহলে আমরাও সে দিকে অগ্রসর হতাম না কিংবা তারাও আমাদেরকে আক্রমণ করত না। সে যা হোক, আপাতত এ পর্যন্ত যা আমাদের দখলে এসেছে, উহার রক্ষণাবেক্ষণ এবং শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন ইত্যাদির দায়িত্ব পালন কর। এখন আর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইও না।"

আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা)-এর এ ফরমানের মধ্য দিয়ে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব সমাপ্ত হল। এবার তিনি গভর্ণর হিসেবে মাদায়েনকে প্রদেশের কেন্দ্রস্থল করে দেশের শাসন-ভার গ্রহণ করলেন। আর এ কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, কোন বিজাতির উপর রাজত্ব করা এবং সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করা ঠিক তেমনি কষ্টসাধ্য,

যেমনি কষ্টসাধ্য কোন দেশ জয় করে নিজের দখলে আনা। হযরত সা'দ (রা)-এর ব্যক্তিগত যোগ্যতা, খোদা প্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধি ও সাহসের কারণে তিনি এতদুভয় কাজে পূর্ণমাত্রায় জয়যুক্ত হন। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা ও রণকৌশলের যে নমুনা প্রদর্শন করেছেন, তার চাইতে উত্তম কোন পন্থা সে যুগে আর ছিল না। তিনি খলিফাতুল মুসলেমীনের ইঙ্গিতে সমগ্র ইরাকের আদমশুমারি ও ভূমি জরিপের কাজ সম্পন্ন করেন এবং বিজিত এলাকার সমুদয় ভূমি তথাকার প্রকৃত অধিবাসীদের কাছেই রেখে দিলেন। অবশ্য যে সমস্ত জমির কোন মালিক ছিল না, নতুন সূত্রে সেগুলো অন্যদেরকে বন্দোবস্ত দেয়া হয়। জিযিয়া ও আয়কর ইত্যাদির তালিকা তৈরি করেন এবং প্রজাদের শান্তির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন, বিশেষতঃ তিনি আজমীদের সাথে অত্যন্ত ভদ্রতার পরিচয় দিয়েছেন। ফলে, তারাও অত্যধিক আন্তরিকতা সহকারে প্রত্যেক কাজে হযরত সা'দ (রা)-এর সহায়তা করে। এমন কি, হযরত সা'দ (রা)-এর ভদ্র ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বড় বড় জমিদার, আমীর, রঈস প্রমুখ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত সা'দ (রা) দীর্ঘকাল ধরে মাদায়েনে বাস করেন। অতঃপর তিনি অনুভব করেন যে, এখানকার আবহাওয়ার দরুন আরবদের শরীরের রং পরিবর্তন ও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি হযরত ওমরকে জানালেন। উত্তরে হযরত ওমর (রা) বললেন, "আরব সীমান্তে কোন এক জায়গা পছন্দ করে সেখানে একটি নতুন শহর নির্মাণ কর। সে শহরে আরবদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে তাকে প্রদেশের রাজধানীরূপে গঠন করে নাও।"

হযরত ওমর (রা)-এর নির্দেশ মোতাবেক হযরত সা'দ (রা) মাদায়েন ত্যাগ করে আরব সীমান্তে পছন্দসই স্থান নির্বাচন করে তথায় নতুন এক শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তার নামকরণ করা হল কুফা। কুফা নগর নির্মিত হয়ে গেলে আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকজনকে তিনি বিভিন্ন মহল্লায় থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। শহরের মধ্যবর্তী স্থানে বিরাটাকারের এক জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদে এক সঙ্গে অন্তত চল্লিশ হাজার মানুষের নামায আদায় করার স্থান ছিল।

হিজরী একুশ সনে ইরানীরা ইরাকে আজমে খুবই তোড়জোড় সহকারে যুদ্ধ প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে বিজিত এলাকা হতে বহিষ্কার করে দেয়া। হযরত ওমর (রা) ইরানীদের এ যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ অবগত হয়ে ইসলামি সৈন্যের সমস্ত কেন্দ্রে সমুদয় সৈন্যদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দান করলেন। কুফা ছিল মুসলিম ফৌজের সর্ববৃহৎ কেন্দ্রস্থল। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করলেন। খলিফাতুল মুসলেমীনের ইঙ্গিতে তিনি নো'মান ইবনে

মুকাররেনকে এই ফৌজের আমীর নিযুক্ত করেন। তিনি ইতিপূর্বেও তাঁর অধীনে অস্ত্র সরবরাহকারীদের অফিসার ছিলেন; কিন্তু এখানে এসে এমন একদল সৃষ্টি হল, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে মোটেই প্রস্তুত নহে। তারা বলাবলি করতে লাগল, বসরার অধিবাসীরা অনর্থক পারস্যের উপর আক্রমণ চালিয়ে এ যুদ্ধের ঝুঁকি নিচ্ছে। হযরত সা'দ (রা) খলিফাতুল মুসলেমীনের খেদমতে এ দলের অভিযোগ জানালেন বিধায় সেই দলের কিছুসংখ্যা লোক বিশেষত জাররাহ ইবনে সেনান এবং তার সঙ্গীরা হযরত সা'দ (রা)-এর ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়াল। এমন কি, তারা মদীনায় যেয়ে খলিফাতুল মুসলেমীনের খেদমতে হাজির হল এবং হযরত সা'দ (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ জ্ঞাপন করে বলল যে, তিনি ঠিকমত নামাযও পড়ান না।

সকলেই জ্ঞাত ছিলেন যে, হযরত সা'দ (রা)-এর ন্যায় সাহাবীর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। স্বয়ং হযরত ওমর (রা)-ও বিশ্বাস করতেন যে, সা'দের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ শুধু ভিত্তিহীনই নহে বরং দুরভিসন্ধিমূলকও বটে। তবুও তিনি বিচারক হিসেবে হযরত মোহাম্মদ ইবনে মোসলেমাকে তদন্তের জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি কুফা আগমন করে প্রত্যেক মসজিদে গিয়ে নামাযীদের কাছে উক্ত অভিযোগের সত্যতা যাচাই করেন। কিন্তু প্রত্যেক জায়গায়ই সকলে একবাক্যে উক্ত অভিযোগ অস্বীকার করল। অতঃপর মোহাম্মদ ইবনে মোসলেমা তদন্ত কাজ সমাপ্ত করে অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত (অর্থাৎ হযরত সা'দ) উভয়কে একসঙ্গে করে মদীনা পৌঁছলেন। হযরত ওমর (রা) হযরত সা'দকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "সা'দ! কি রকম নামায পড়াও। লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে কেন ?"

হযরত সা'দ (রা) উত্তর দিলেন, "প্রথম দুই রাকাতে লম্বা সূরা পড়ি এবং পরবর্তী দুই রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়ি।"

তা শ্রবণ করে হযরত ওমর (রা) বললেন, "হ্যাঁ, তোমার সম্বন্ধে তাই আমার ধারণা ছিল এবং তাই ঠিক।"

হযরত সা'দ (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হল। তবুও হযরত ওমর (রা) চিন্তা করলেন, যেহেতু একদল সা'দের বিরুদ্ধে গিয়েছে, তাই এখন আর তাঁকে পূর্ণবার গভর্ণর পদে নিযুক্ত করা ভাল হবে না। অতঃপর হযরত সা'দ (রা) যাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে এসেছেন, হযরত ওমর (রা) তাকেই স্থায়ী গভর্ণর নিযুক্ত করে দিলেন।

হিজরী তেইশ সনে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) শাহাদতবরণ করেন। জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্তের নাম ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ করা হলে তিনি ছয়জন বুযুর্গের নাম উল্লেখ করেন। এ ছয়জনের মধ্যে

হযরত সা'দও ছিলেন। হযরত ওমর (রা) অবশেষে হযরত সাদ (রা) সম্পর্কে একথাও বললেন, "যদি সা'দ খলিফা নির্বাচিত না হয়, তাহলে যে নির্বাচিত হবে, সে যেন সা'দের যোগ্যতার সুযোগ গ্রহণ করে। কারণ, আমি সা'দকে তাঁর কোন দুর্বলতা কিংবা অন্যায়ের জন্য অপসারণ করিনি।"

হযরত ওমর (রা)-এর কাফন-দাফন কাজ শেষান্তে পরামর্শ সভা কর্তৃক হযরত ওসমান (রা) খলিফা নির্বাচিত হন। তারপর তিনি হযরত ওমরের অসিয়ত মোতাবেক সা'দকে কুফার গভর্ণর নিযুক্ত করলেন। এ গভর্নরী ছিল তাঁর কর্মময় জীবনের শেষাংশ।

হিজরী ছাব্বিশ সনে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) কুফার অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর সাথে হযরত সা'দ (রা)-এর মতনৈক্য সৃষ্টি হল। হযরত সা'দ (রা) অপসারিত হলেন।

অপসারিত হওয়ার পর হযরত সা'দ (রা) মদীনায় অবস্থান করেন। হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতের শেষ আমলে যখন চতুর্দিকে চরম ফেতনা-ফাসাদ ও বিশৃংখলা চলছিল, তখনো তিনি কোন কাজে মনোযোগী হননি। অবশ্য বিদ্রোহী কর্তৃক যখন হযরত ওসমান (রা)-এর ঘর অবরুদ্ধ হয়, তখন তিনি বিদ্রোহীদেরকে বুঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

মদীনার দশ মাইল দূরে আতীক নামক স্থানে হযরত সা'দ (রা) নিজের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। কুফার গভর্ণর পদ হতে অপসারিত হওয়ার পর হতে শেষ পর্যন্ত সে ঘরে থেকেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। শেষ বয়সে তাঁর দুর্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। অবশেষে সত্তর কি বাহাত্তর বছর বয়সে হিজরী পঞ্চান্ন সনে তিনি পরলোক গমন করেন।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর এল্‌ম ছিল অত্যধিক। হযরত ওমর (রা) বলেন, "যদি সা'দ রাসূলূল্লাহ্ (সা)-এর কোন হাদীস বর্ণনা করেন, তাহলে তার সত্যতা সম্পর্কে অপর কারো কাছে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই।"

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর স্বভাব-চরিত্রের ইতিহাসে খোদাভীতি, রাসূলের প্রতি মহব্বত, পরহেযগারী, নম্রতা এবং পরের মুখাপেক্ষী না হওয়া ইত্যাদি অত্যন্ত উজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁর খোদা-ভীতি এবং এবাদত-বন্দেগীর অবস্থা এরূপ ছিল যে, অধিকাংশ সময়ই তিনি শেষ রাত্রিতে মসজিদে নববীতে এসে নামায পড়তেন। দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্যুত জীবন-যাপন করতে পছন্দ করতেন। কিন্তু শরীয়ত যেহেতু সে প্রকারের জীবন-যাপনে বাধা দান করছে, তাই তিনি দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি।

হযরত সাঈদ (রা)

অবশ্যই ১ সপ্তাহের ভিতর বই জমা দিতে হবে।

হযরত ওমর (রা)-এর আমলে শাম-দেশে সৈন্য প্রেরণ করা হয়। তখন হযরত সাঈদ ইবনে যাইদ (রা) হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা)-এর আমলে শাম-দেশে পরিচালনাধীন পদাতির বাহিনীর কমাণ্ডার নিযুক্ত হন। দামেস্ক অবরোধ এবং ইয়ারমুক যুদ্ধে হযরত সাঈদ (রা) বীরবিক্রমে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হযরত আবু ওবাইদাহ (রা) হযরত সাঈদ (রা)-কে দামেস্কের গভর্ণর করে প্রেরণ করেন। কিন্তু জেহাদের প্রেরণায় গভর্ণর পদ হতে তিনি বিরক্তিভাব প্রকাশ করে হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা)-এর কাছে লিখে জানালেন, "আপনারা জেহাদ করবেন আর আমি বঞ্চিত থাকব, আমি তাহা সহ্য করতে পারব না। যে গভর্ণরের পদ গ্রহণ করে আমার জেহাদকে কোরবানী দিতে হবে, আমার দ্বারা তা সম্ভবপর হচ্ছে না।"

সুতরাং এ চিঠি হস্তগত হওয়ার সাথে সাথেই অনতিলিম্বে অপর একজনকে আমার স্থলে প্রেরণ করুন। অতি সত্বরই আমি আপনার সাক্ষাৎ লাভ করব। হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) হযরত সাঈদের জেহাদের এ প্রেরণা দেখে অবশেষে হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-কে দামেস্কের গভর্ণর করে প্রেরণ করেন এবং হযরত সাঈদ (রা) পুনরায় যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হন।

তাঁর নাম সাঈদ, কুনিয়াত আবুল আওয়ার। পিতার নাম যাইদ এবং মাতার নাম ফাতেমা বিনতে বা'জাহ্। তাঁর বংশগত শাজরা ছিল নিম্নরূপ– সাঈদ ইবনে যাইদ, ইবনে আমর, ইবনে ফোযাইল, ইবনে আবদুল ওয্যা, ইবনে রিয়াহ্, ইবনে আবদুল্লাহ্, ইবনে কুরয, ইবনে যারাহ্, ইবনে আদী, ইবনে কা'ব ইবনে লুওয়াই আল-কারশী আল-আদাভী।

হযরত সাঈদ ইবনে যাইদের শাজরা কা'ব ইবনে লুওয়াই পর্যন্ত গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশের সাথে এবং ফোযাইল ইবনে আবদুল ওয্যা পর্যন্ত গিয়ে হযরত ওমর (রা)-এর বংশের সাথে মিলিত হয়। হযরত সাঈদের পিতা যাইদ সেই সৌভাগাবানদেরই একজন, যিনি ইসলামের পূর্বেই কুফর ও শিরকের অন্ধকারে তওহীদের আলোকবর্তিকা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি সেই অন্ধকার যুগেও কোন প্রকারের পাপচারে লিপ্ত হননি। এমন কি, মুশরিকদের হাতে যবাইকৃত জন্তুর গোশ্ত পর্যন্ত খাননি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে একদা তানঈমের পথে ওয়াদিয়ে বালদাহ নামক স্থানে হযরত সাঈদের পিতা যাইদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাৎ হয়। সেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে খাবার পেশ করলে তিনি অস্বীকার করেন। অতঃপর যাইদের সামনে পেশ করা হলে তিনিও এ বলে আহারে অস্বীকার করেন যে, আমি তোমাদের মূর্তির জন্য যবাইকৃত খাবার খাই না।

যাইদের অন্তঃকরণ কুফর ও শিরক হতে বহু দূরে ছিল। তিনি সত্য ধর্মের সন্ধানে দূর-দূরান্তের সফর করে এবং ইব্রাহীম (আঃ)-এর দ্বীনে হানিফ গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) নবুওত প্রাপ্ত হয়ে যখন প্রকৃত দ্বীনে হানীফের স্বরূপ জগদ্বাসীদের সম্মুখে পেশ করেন এবং তওহীদের তবলীগ আরম্ভ করেন, তখন যদিও সে দ্বীনে হানীফের পিপাসু যাইদ পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর কৃতী সন্তান হযরত সাঈদ (রা)-এর জন্য তওহীদের এ অমিয়বাণী অত্যন্ত পরিচিত ছিল। অতএব, তিনি অত্যন্ত উদ্দীপনা সহকারে দ্বীনে হানীফের এ আওয়াজে সাড়া দিলেন এবং তাঁর নেকবখ্ত স্ত্রীসহ ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত সাঈদের স্ত্রী হযরত ফাতেমা (রা) হযরত ওমর (রা)-এর আপন ভগ্নি ছিলেন। কিন্তু স্বয়ং ওমর (রা) তখন পর্যন্ত ইসলামের হাকীকত অবগত ছিলেন না। ভগ্নি এবং ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণের কথা শ্রবণ করে তিনি রাগান্বিত হয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই প্রচণ্ড আঘাত হানেন। এমন কি, তাঁর রক্তে লাল হয়ে গেলেন। কিন্তু ইসলামের মহব্বতে তাঁরা এমনই আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল যে, এসব মারপিট দ্বারা ইসলামের প্রেমে কোন প্রকারের পরিবর্তন ঘটেনি। বরং ইসলামের প্রতি তাঁদের মহব্বত আরো বর্ধিত হয়। এমন কি, তাঁদের অবিচলতার দ্বারা হযরত ওমরকে ইসলামের সত্যতা প্রত্যক্ষ করান এবং ওমর ইবনে খাত্তাবকে "ফারুকে আযম"-এর পদে উন্নীত হওয়ার পথ সুগম করে দেন। [আরো জানার জন্য হযরত ওমরের জীবনী দেখুন।]

হিজরতের সময় হযরত সাইদ (রা) মুহাজেরীনের প্রথম দলের সাথে মদীনা শরীফ উপনীত হন। তিনি মদীনা শরীফ পৌঁছে হযরত রেফাআ ইবনে আবদুল মুনযের আনসারের মেহমান হন। কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সাইদ (রা) এবং হযরত রাফে' ইবনে মালেক আনসারীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সৃষ্টি করে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় সনে কোরাইশের সেই বিখ্যাত বণিক দল, যে দলটিকে উপলক্ষ করে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়, শাম দেশ হতে এসেছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সাঈদ ইবনে যাইদ (রা) এবং হযরত তালহা (রা)-কে গুপ্তচর হিসেবে প্রেরণ করেন। তাঁরা শাম সীমান্তে তুজবার নামক স্থানে কশদ জোহানীর মেহমান

হন। কোরাইশ বণিকদল সীমান্ত অতিক্রম করলে উভয় গুপ্তচর বণিক দলের দৃষ্টি এড়িয়ে দ্রুতবেগে মদীনার দিকে রওয়ানা হন, যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই বণিকদলটির সংবাদ দিতে পারেন। কিন্তু বণিকদল কিছুটা সন্দেহ করে সমুদ্র তীরবর্তী পথ ধরে চলতে লাগল। এ বণিক দল এবং তাদের সাহায্যকারী দল, যারা মক্কা হতে এসেছিল, উভয় দল একত্র হয়ে মুসলমানদের সাথে বদরের ময়দানে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, যার ফলে সমগ্র জগতে ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত হয়।

বদর যুদ্ধে তিনি এত বীরবিক্রমে তরবারী চালাচ্ছিলেন যে, তাঁর তরবারীর ধার পড়ে গিয়েছিল। তার শরীরে অসংখ্য ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং একটি ক্ষত চিরদিনের জন্য স্থায়ী হয়ে যায়। বদর যুদ্ধে তিনি হলুদ রঙের পাগড়ি পরেছিলেন। তাঁর এ পোশাক দেখে রাসূল (সা) বললেন, "আজ ফেরেশতাগণ এ রঙের পোশাক পরে এসেছেন।"

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বিপাকের সময় রাসূল (সা)-কে কেন্দ্র করে যে প্রতিরোধ ব্যূহ তৈরি করেছিলেন, হযরত যুবাইর (রা) তাদের অন্যতম ছিলেন।

খাইবার যুদ্ধেও তিনি অসম্ভব সাহসিকতার পরিচয় দেন। এ যুদ্ধে ইহুদীদের নেতা মুরাহহির নিহত হয়। ফলে তার ভাই ইয়াসির ওয়ামক রেগে যুদ্ধের ময়দানে এসে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহবান জানালো। হযরত যরাইব (রা) ইয়াসিরের মোকাবেলায় গিয়ে দাঁড়ান। ইয়াসির বেশ তাগড়া জওয়ান ছিল। তাই যুবাইর (রা)-এর না ভয় পেয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমার সন্তান আজ শহীদ হয়ে যাবে। উত্তরে রাসূল (সা) বললেন, না, যুবাইর শহীদ হবে না; বরং যবাইর ইয়াসিরকে হত্যা করবে। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল যুবাইর ইয়াসিরকে তলোয়ারের কোপে দু'ভাগ করে ফেললেন।

হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতকালে ইয়ারসূকের যুদ্ধে যুবাইর (রা) দুঃসাহসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ নিলে মুসলিম সৈন্যরা তাঁর নেতৃত্বে রোমান বাহিনীর মধ্যভাগে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। হযরত যুবাইর অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আক্রণ পরিচালনা করেন এবং রোমান বাহিনীর প্রতিরোধ ব্যূহভেদ করে অপরপ্রান্তে পৌঁছে যান। কিন্তু সঙ্গীরা তাঁকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে তিনি পুনরায় রোমান বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে নিজ বাহিনীর কাছে ফিরে আসেন। কিন্তু আসার সময় তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন।

শাম বিজয়ের পর হতে হযরত সাঈদ ইবনে যাইদের জীবন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ছিল। হিজরী পঞ্চাশ অথবা একান্ন সনে সত্তর বছর বয়সে তিনি ইহকাল ত্যাগ করেন। মদীনার পার্শ্ববর্তী আতীক নামক স্থানে হযরত সাঈদ (রা)-এর আবাসগৃহ ছিল। শেষ বয়সে তিনি স্বীয় গৃহে থেকেই আল্লাহ্র এবাদতে মগ্ন থাকতেন। তাঁর ইন্তেকালও সে স্থানেই হয়। শুক্রবারে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা)

জুমুআর নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন, এমন সময় হযরত সাঈদের ইন্তেকালের সংবাদ পান। সংবাদ পেতেই হযরত সাঈদের ঘরের উদ্দেশ্যে আতীকের দিকে গমন করেন। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) গোসলের বন্দোবস্ত করেন এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। অতঃপর মদীনায় এনে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত সাঈদ ইবনে যাইদ (রা) সর্বদা পার্থিব লোভ-লালসা এবং সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি হতে বহু দূরে থাকতেন। আতীক নামক স্থানে তাঁর যৎসামান্য জমি ছিল। তা দ্বারাই তিনি কোন মতে জীবন-যাপন করতেন। কিঞ্চিৎ আয়ের উপর অত্যন্ত দারিদ্র্য অবস্থায় জীবন-যাপন করতে দেখে শেষ বয়সে হযরত ওসমান (রা) ইরাকেও তাঁকে যৎসামান্য জমি প্রদান করেন।

হযরত আমীর মো'আবিয়া (রা)-এর আমলে আরওয়া নামীয় জনৈকা মহিলা মদীনার গভর্ণর মারওয়ান ইবনে হাকামের দরবারে অভিযোগ করল যে, "হযরত সাঈদ ইবনে যাইদ (রা)-এর জায়গীরের (জমি) সংলগ্ন আমার ব্যক্তিগত কিছু ভূমি আছে। হযরত সাঈদ তা স্বীয় জমির সঙ্গে যোগ করেছেন। আমি তার বিচার চাই।"

মারওয়ান ইবনে হাকাম অভিযোগ শ্রবণ করে ঘটনার সত্য-মিথ্যা যাচাই করার জন্য দু'জন লোক নিযুক্ত করেন। হযরত সাঈদ (রা) এ সংবাদ পেয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় মালের রক্ষণাবেক্ষণে নিহত হবে, সে ব্যক্তি শহীদ হবে।" অতঃপর মারওয়ান ইবনে হাকামকে উদ্দেশ করে বললেন, "আপনি কি মনে করেন যে, আমি তার (অভিযোগকারিণী আরওয়ার) উপর যুলুম করেছি? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে শ্রবণ করেছি; তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি অপরের কয়েক ইঞ্চি পরিমাণ জমিও যুলুম করে দখল করবে, রোজ কেয়ামতে সেই ব্যক্তি ঐরূপ সাত গুণ জমির হার নিজ গলায় ঝুলাবে।"

মারওয়ান বললেন, "আপনার কসম করে বলতে হবে যে, আপনি আরওয়ার জমি নিজের জমির সাথে যোগ করেন নি।"

এ কথা শ্রবণ করে হযরত সাঈদ (রা) নিজ জমির অধিকার সেই আরওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়ে বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! যদি এ মহিলাটি নিজের দাবিতে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে সে অন্ধ হয়ে যাক এবং তার বাড়িতে কূপ আছে তা তার জন্য কবর হোক।"

কয়েকদিনের মধ্যেই মহিলাটি দৃষ্টি-শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং কিছুকাল এভাবে অন্ধ অবস্থায় কাল যাপন করে একদিন নিজ বাড়ির কূপে পতিত হয়ে

মারা যায়। অতঃপর এই ঘটনা মদীনাবাসীর জন্য একটি দৃষ্টান্তে পরিণত হয়। এমন কি, কারও প্রতি কেউ বদদোয়া করলে ঠিক সেই বদদোয়াই করত, যা হযরত সাঈদ ইবনে যাইদ (রা) আরওয়ার জন্য করেছিলেন। অর্থাৎ, 'আল্লাহ্ পাক তোমাকে আরওয়ার ন্যায় অন্ধ করুক।'

হযরত সাঈদ ইবনে যাইদ (রা)-এর আমলে বহু রকমের বিপ্লব হয় এবং বহু ঘরোয়া যুদ্ধও ঘটে। কিন্তু তিনি ঐ সমস্ত ঝগড়া-ফাসাদে পতিত হতেন না এবং নিজেকে সব সময় সেসব দলাদলি হতে রক্ষা করতেন। তবে দলাদলির সময় যেই দল অথবা যেই ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি যে রকম ধারণা করতেন, তা প্রকাশ করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। হযরত ওসমান (রা) শহীদ হওয়ার পর কুফার জামে মসজিদে তিনি প্রায় বলতেন, "তোমরা হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে যেরূপ ব্যবহার করেছ; তাতে যদি ওহোদের পাহাড়ও কম্পমান হয়, তাহলে তেমন বিচিত্র কিছুই নহে।"

আমীর মো'আবিয়া (রা)-এর পক্ষ হতে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) কুফার গভর্ণর নিযুক্ত ছিলেন। একদা তিনি (হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা) জামে মসজিদের জনসমাবেশে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় হযরত সাঈদ ইবনে যাইদ (রা) তশরীফ আনয়ন করলেন। হযরত সাঈদ (রা)-কে দেখে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন। একটু পরে অপর এক ব্যক্তি মসজিদে আগমন করে হযরত আলী (রা) সম্পর্কে অন্যায় কথা বলতে আরম্ভ করল। হযরত সাঈদ (রা) তা সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলেন, 'মুগীরা! হে মুগীরা!! লোকে তোমার সম্মুখে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরম বন্ধুদেরকে মন্দ-তিরস্কার করছে; আর তুমি বাধা দিচ্ছ না?"

তারপর তিনি আশারা-মুবাশ্‌শারা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের নাম উল্লেখ করতে করতে নয় জনের নাম উল্লেখ করেন। (এদের মধ্যে হযরত আলী (রা)-এর নামও ছিল) এবং বলেন, এদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেহেশ্‌তের সুসংবাদ দান করেছেন (অথচ তোমরা তাদেরকে মন্দ-তিরস্কার করছ। তা যে বড়ই পরিতাপের বিষয়) আর যদি তোমরা বল, তাহলে আমি দশম ব্যক্তির নামও বলতে পারি। জনসাধারণের অনুরোধে তিনি বললেন, দশম ব্যক্তি স্বয়ং আমি।

হযরত সাঈদ ইবনে যাইদ (রা)-এর জীবনী খুবই অল্পমাত্রায় জানা গেছে। তবে তিনি যে ইসলামের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এতে কারো দ্বিমত নেই। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগে থাকতেন এবং নামাযে থাকতেন তাঁর পিছনে।

হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা)

ওহোদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মোবারক যখম হল এবং লৌহবর্মের দুইটি কড়া বিধে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এতে কষ্ট পাচ্ছিলেন। হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) স্বীয় দাঁত দ্বারা সজোরে টেনে উক্ত কড়াদ্বয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহ মোবারক হতে বের করে আনলেন। কিন্তু এ কড়াদ্বয় এমন বেকায়দায় বিদ্ধ হয়েছিল যে, তা বের করতে হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা)-এর দুইটি দাঁত শহীদ হয়ে যায়। হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খাতিরে কেবল দুইটি দাঁত কেন, প্রাণ দিতে পর্যন্তও তিনি কোন দ্বিধাবোধ করতেন না এবং করেন নি।

তাঁর নাম ছিল আমের। আবু ওবাইদাহ্ ছিল কুনিয়াত। আর আমীনুল উম্মত ছিল তাঁর উপাধি। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ্। কিন্তু তিনি দাদার সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে ইবনুল জাররাহ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর বংশ পরিচয় নিম্নরূপ ঃ আমের ইবনে আবদুল্লাহ্, ইবনে জাররাহ্, ইবনে হেলাল, ইবনে উহাইব, ইবনে জাররাহ্, ইবনে হারেস, ইবনে ফেহর আল কারশী আল-ফেহরী। হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা)-এর বংশধারা তাঁর পঞ্চম পুরুষ ফেহ্‌র-এর সাথে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশের সাথে মিলিত হয়েছে।

হযরত আবুবকর (রা)-এর তবলীগে হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু ওবাইদাহ্‌র ইসলাম গ্রহণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরকামের ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেননি। অর্থাৎ, প্রাথমিক অবস্থায়ই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর কোরাইশদের যুলুম-অত্যাচারে জর্জারিত হয়ে একে একে দু'বার তিনি হাব্‌শার দিকে হিজরত করেন। তৃতীয় এবং শেষবারে সকলের সাথে মদীনায় হিজরত করেন। এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবু ওবাইদাহ্ এবং হযরত সা'দ ইবনে মুআযের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সৃষ্টি করে দিলেন।

কোরাইশরা মুসলমানদেরকে হিজরতের পরেও শান্তিতে জীবন-যাপন করতে দিতে রাজি ছিল না। তারা মুসলমানদেরকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করল। বদর যুদ্ধ হল তার প্রথম সোপান। হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) এ যুদ্ধে অত্যন্ত বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন।

পরিখা যুদ্ধে বনু কোরাইযাকে শায়েস্তা করার সংকল্পে তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। অতঃপর হিজরী ষষ্ঠ সনে সা'লাবা ও অনমার গোত্রের লোকেরা খাদ্যাভাবে মদীনা শরীফের আশেপাশে যখন লুণ্ঠন এবং ডাকাতি আরম্ভ করল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ হতে হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) দস্যুদেরকে শায়েস্তা করার জন্য আদিষ্ট হন। তিনি চল্লিশ জন জোয়ান সঙ্গে নিয়ে দস্যুদের কেন্দ্রস্থল যিল-কিস্সার উপর অতর্কিতে আক্রমণ করেন। ফলে অনেক দস্যু মারা যায়। অবশিষ্ট সকলেই পাহাড়-পর্বতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

সেই বছরই বাইআতে রেযওয়ান অনুষ্ঠিত হয় এবং তিনি তাতে শরীক হন। এমন কি, হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় কোরাইশদের সাথে যে চুক্তি সম্পাদন হয়, এতে আবু ওবাইদাহ্ (রা)-এরও দস্তখত ছিল। অতঃপর হিজরী সপ্তম সনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে খাইবার যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। খাইবার বিজয়ের সময় তিনি অত্যধিক সাহসিকতার পরিচয় দেন।

এ সমস্ত যুদ্ধের পর রাসুলুল্লাহ্ (সা) হযরত আমর ইবনুল আসকে একদল জোয়ানের সাথে যাতুস্ সালাসিলের দিকে প্রেরণ করেন। তাঁরা তথায় পৌঁছে জানতে পারলেন যে, শত্রুর সংখ্যা অত্যধিক। তাই তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা)-এর নেতৃত্বে দু'শ জোয়ান যোদ্ধা প্রেরণ করলেন। এ দু'শ যোদ্ধার মধ্যে হযরত আবুবকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা)-ও ছিলেন। এ দল যখন হযরত আমর ইবনুল আসের সৈন্যদের সাথে মিলিত হয়, তখন মুসলিম সেনাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সেনাপতির পদ নিয়ে একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়। হযরত ওবাইদাহ্ (রা)-এর পাল্লা যদিও বহুগুণে ভারী ছিল, তবুও তিনি হযরত আমার ইবনুল আসের অনুরোধে তাঁকে সেনাপতিরূপে স্বীকার করে নেন এবং যুদ্ধকালে অত্যধিক যুদ্ধবিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে শত্রুকে পরাভূত করেন।

হিজরী অষ্টম সনের রজব মাসে হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা)-এর নেতৃত্বে সামুদ্রিক এলাকার দিকে অভিযান চালানো হয়। এ অভিযানে কোন যুদ্ধ হয়নি। অতএব, মুজাহেদীন নিরাপদে মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তন করেন।

হিজরী অষ্টম সনেই মক্কা শরীফ বিজয় হয়। তার পর পরই হুনাইনের যুদ্ধ এবং তায়েফের যুদ্ধ ঘটে। প্রত্যেক যুদ্ধেই হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং অত্যধিক সাহসিকতার পরিচয় দেন।

জেহাদে অংশগ্রহণ ছাড়া হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা)-এর আরো বহু গুরুত্বপূর্ণ খেদমত রয়েছে। হিজরী নবম সনে নাজরানবাসীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ করল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের জন্য

এমন একজন ধর্মশিক্ষক দিন, যিনি ধর্মীয় শিক্ষা তো দিবেনই, উপরন্তু আমাদের মধ্যকার বিবাদের মীমাংসা করবেন। অর্থাৎ, তিনি আমাদের বিচারকও।' এ কথা শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "হে আবু ওবাইদাহ্! উঠ।"

হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) উঠে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নাজরানবাসীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এ আবু ওবাইদাহ্ উম্মতের আমীন। আমি তাঁকে তোমাদের সঙ্গে পাঠাচ্ছি।"

হযরত আবুবকর (রা)-এর খেলাফতের তৃতীয় বর্ষ অর্থাৎ, হিজরী তের সনে শাম দেশের উপর চতুর্মুখী আক্রমণ চালানোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী হযরত আবু ওবাইদাহ্কে হেমসের দিকে, হযরত ইয়াযদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে দামেস্কের দিকে, হযরত শোরাহ্বীলকে জর্দানের দিকে এবং হযরত আমর ইবনুল আসকে ফিলিস্তীনের দিকে প্রেরণ করেন। খলিফা হযরত আবুবকর (রা) তাঁদেরকে বললেন, "আপনারা সকলে একত্র হলেই আবু ওবাইদাহ্ সেনাপতি হবেন।"

আরব সীমান্ত অতিক্রম করে যখন হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন বহুসংখ্যক রুমী ফৌজের মোকাবিলা করতে বাধ্য হন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সমুদয় ইসলামি ফৌজকে একত্রিত করলেন এবং খলিফাতুল মুসলেমীনের খেদমতে আরো সাহায্য প্রার্থনা করেন। খালেদ ইবনে ওয়ালীদ, যিনি ইরাকের দিকে প্রেরিত হয়েছিলেন, খলিফাতুল মুসলেমীনের নির্দেশে ইসলামি ফৌজের সাহায্যার্থে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি ছোটখাট যুদ্ধ করতে করতে শামী ফৌজের সাথে এসে মিলিত হন। সম্মিলিত ইসলামি ফৌজ বসরা, ফাহল এবং আজনাদাইন ইত্যাদি জয় করে অবশেষে দামেস্ক অবরোধ করেন।

দামেস্কের অবরোধ বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ই খলিফা মুসলেমীন হযরত আবুবকর (রা) ইন্তেকাল করেন এবং হযরত ওমর (রা) খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন। হযরত ওমরের খেলাফত-এর প্রথম অবস্থাতেই হযরত খালেদ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে দামেস্কের কিল্লার দেয়াল অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং কিল্লার দরজা খুলে দেন। হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কিল্লার বাইরে অপেক্ষা করছিলেন, দরজা খোলার সাথে সাথেই তিনি ভিতরে প্রবেশ করেন। খ্রিস্টানরা এ অভাবনীয় অবস্থা দেখে প্রধান সেনাপতি হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা)-এর সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হয়।

দামেস্ক বিজয়ের পর মুসলিম সৈন্যদল সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয়ে ফাহ্ল নামক স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করলেন। রুমী ফৌজের ঘাঁটি ফাহলের সম্মুখে বৈসান নামক স্থানে ছিল। রোমকরা মুসলিম সেনাপতি হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা)-এর

খেদমতে সন্ধির প্রস্তাবসহ দূত প্রেরণ করল। বার্তাবাহকের কথায় উভয়পক্ষের মুখপাত্র নিযুক্ত হল। মুসলমানদের পক্ষ হতে হযরত মুআয ইবনে জাবাল মুখপাত্র নিযুক্ত হলেন। কিন্তু আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে রোমকরা সরাসরি প্রধান সেনাপতি হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা)-এর সাথে আলোচনার জন্য পুনরায় প্রস্তাব পাঠাল। হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) সেই প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। রুমী মুখপাত্র যখন মুসলিম সেনাদের কাছে এসে পৌঁছল, তখন তারা মুসলমানদের অবস্থা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গলে। তারা দেখল যে, প্রত্যেক মুসলমানই–কি বড়, কি ছোট। এই রঙে রঞ্জিত। বড়-ছোটর কোনই পার্থক্য নাই, সকলেই এক সমান। অবশেষে মুখপাত্র জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের সেনাপতি কে?"

মুসলিম সৈন্যগণ হযরত আবু ওবাইদাহ্র দিকে ইঙ্গিত করলেন। হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) তখন মাটির উপর বসেছিলেন।

মুখপাত্রটি আশ্চার্যন্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "প্রকৃতপক্ষে তুমিই মুসলিম সেনাপতি?"

হযরত আবু ওবাইদাহ্ উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ।"

মুখপাত্র আবার বলল, "তোমার সৈন্যদের জনপ্রতি দুটি করে স্বর্ণের আশরাফী দেয়া হবে, তোমরা এখান হতে চলে যাও।"

হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) রুমী মুখপাত্রটির এ ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণ করে এবং তার অবস্থা দেখে মুসলিম সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য তৈরি হওয়ার নির্দেশ দান করলেন। দ্বিতীয় দিন যুদ্ধ আরম্ভ হল। হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) মুসলিম সেনাদের প্রত্যেক দলের নিকট গিয়ে ঘোষণা করলেন, "হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! ধৈর্য সহকারে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর। কেননা, আল্লাহ্ পাক ধৈর্যধারণকারীদের সাথে রয়েছেন।"

হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ ছিলেন এবং অতিশয় বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন। এমন কি, মুসলমানদের অল্পসংখ্যক যোদ্ধা রোমকদের পঞ্চাশ হাজার বীর সৈন্যকে পরাজিত করে জর্দানের সম্পূর্ণ এলাকা দখল করে নেন।

আমর ইবনুল আসের দায়িত্বে ফিলিস্তীন অভিযান শুরু হয়। তিনি বড় বড় শহর দখল করে বহুকাল ধরে বাইতুল মোকাদ্দাস অবরোধ করে রাখেন। হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) বিজয়াভিযান হতে অবসরপ্রাপ্ত হওয়ার পর তিনিও বাইতুল মোক্কাদ্দস অবরোধকারী সৈন্যদের সাথে এসে মিলিত হন। খ্রিস্টানরা বহুকাল ধরে কিল্লায় অবরুদ্ধ থাকার পর বিরক্ত হয়ে অবশেষে সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করল। এমন কি, বিশ্বাস স্থাপনের জন্য তারা এ শর্তও আরোপ করল

যে, আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা) স্বয়ং তশরীফ আনয়ন করে নিজ হস্তে সন্ধিপত্র লিখবেন। হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) হযরত ওমর (রা)-এর খেদমতে খ্রিস্টানদের এ শর্তের কথা উল্লেখ করে তাঁকে শাম দেশে তশরীফ আনয়নের জন্য অনুরোধ করেন। হযরত ওমর (রা) মদীনা শরীফ হতে রওয়ানা হয়ে শাম দেশের জাবিয়া নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন। হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) স্বীয় অফিসারগণকে সঙ্গে নিয়ে জাবিয়ায় পৌঁছে হযরত ওমর (রা)-কে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বাইতুল মোকাদ্দাস-এর নেতৃবর্গও তথায় পৌঁছে সন্ধির শর্তাবলীর স্বীকৃতি দান করে এবং বাইতুল মোকাদ্দাস মুসলমানদের দখলে ছেড়ে দেয়।

হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) ছিলেন দামেস্কের আমীর। কিন্তু সতের হিজরীতে আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা) তাঁকে পদচ্যুত করে হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা)-কে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত করেন। দামেস্ক হতে রওয়ানা হওয়ার সময় তাঁর বিদায় সম্বর্ধনার জবাবদানকালে তিনি বলেন, "আপনাদের আনন্দিত হওয়া উচিত যে, হযরত আমীনুল উম্মত আপনাদের আমীর হয়েছেন।"

হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) এতদুত্তরে বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে শ্রবণ করেছি, তিনি বলেছেন, খালেদ সাইফুম্ মিন সুয়ফিল্লাহ্।" (অর্থাৎ, আল্লাহ্র তলোয়ারসমূহের এক তলোয়ার হলেন খালেদ।) এমনিভাবে সাদরে মহব্বতের মাধ্যমে আমীরের চার্জ বুঝিয়ে দেয়ার পর হযরত খালেদ সেখান হতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) দেশ শাসনের ব্যাপারে মনোযোগী হন।

আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা) শাম দেশে যে সমস্ত সংস্কারমূলক কাজ শুরু করেছিলেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা)-এর হাতে সম্পন্ন হয়। হিজরী আঠার সনে যখন আরব দেশে খাদ্যভাব দেখা দেয়, তখন হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) শাম দেশ হতে চার হাজার উটের পিঠে বোঝাই করে খাদ্যসামগ্রী আরব দেশে প্রেরণ করেন।

ইসলাম প্রচারের বেলায়ও হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। তাঁর তবলীগে হাজার হাজার নর-নারী ইসলাম গ্রহণ করেন। যেমন, তন্নুখ গোত্র, সলীজ গোত্র এবং আরব দেশের আরো বহুলোক, যারা দীর্ঘকাল ধরে শাম দেশে বাস করত এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ছিল, শুধু হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা)-এর তবলীগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কোন কোন রোমক এবং শামী খ্রিস্টানও হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা)-এর চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

হিজরী ১৮ সনে শাম দেশে প্লেগ রোগ দেখা দেয়। হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) প্লেগ রোগে আক্রান্ত হন। রোগের উপশম হচ্ছিল না; বরং ক্রমবর্ধমান ছিল। তাই তিনি হযরত মুআয ইবনে জাবালকে নিজের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন। অতঃপর তিনি লোকজনকে ডেকে অনেক্ষণ পর্যন্ত ওয়ায-নসীহত করলেন। পরে জানালেন, "বন্ধুগণ! এ রোগ আল্লাহ্র রহমত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দোয়া। ইতোপূর্বে অসংখ্য বুযুর্গানে দ্বীন এ রোগে ইহকাল ত্যাগ করেছেন। এখন আবু ওবাইদাহ্ও সেই পথে স্বীয় প্রভুর মিলন প্রার্থী।"

নামাযের সময় হল। হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) স্বীয় স্থলাভিষিক্ত বুযুর্গ মুআয ইবনে জাবালকে নামাযের ইমামতি করার নির্দেশ দান করেন। এদিকে নামায শেষ হয়, ঐদিকে আমীনুল উম্মত হযরত আবু ওবাইদাহ্ ইবনুল জাররাহ্ (রা) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণ, মহব্বত এবং খেদমতে আমীনুল উম্মত সবার আগে ছিলেন। বদর যুদ্ধে তিনি নিজের পিতাকে নিহত করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আরামের জন্য নিজের দুইটি দাঁত শহীদ করেন এবং যাতুস্সালাসেল যুদ্ধে হযরত আমর ইবনুল আসের সাথে মতানৈক্য ঘটিলে হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) শুধু এ জন্য হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-এর অনুসরণ মেনে নেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপোষে মতৈক্যের জন্য নির্দেশ দান করেছেন। অতএব, আবু ওবাইদাহ্ (রা) বলেন, "আমি আপনার অনুসরণ করছি না। অনুসরণ করেছি শুধু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এরশাদের।"

হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) পরহেযগারী এবং খোদাভীতির অদ্বিতীয় নমুনা ছিলেন। পৃথিবী এবং তার সমূদয় নেয়ামত তাঁর দৃষ্টিতে অতি নগণ্য ছিল। শাম দেশের আবহাওয়ায় বড় বড় সাহাবীদের দৈনন্দিন জীবন প্রণালীতে পরিবর্তন ঘটেছিল। কিন্তু হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রা) যে অবস্থায় হযরত ওমর (রা)-এর সাক্ষাৎ করেন, তা ছিল আরবদের সেই সাদাসিধা পোশাক। এমন কি, উটের লাগামটা পর্যন্ত সাধারণ রশি দিয়ে তৈরি ছিল।

ISBN 984-656-007-9

9 789846 560077